প্রকাশক :
শ্রীরঞ্জনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
সরস্বতী সাহিত্য মন্দির
সোনারপুর
২৪ পরগণা।



মুদ্রাকর :
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দত্ত
রূপশ্রী প্রেস
৩৬, সুকিয়া স্ট্রীট
কলিকাতা—৯।



প্রাপ্তিস্থান :
কলিকাতায়—
• ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
• শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
• বেঙ্গল পাব্লিশার্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
• সাহিত্য মন্দির
৫৪।৮, কলেজ স্ট্রীট।



(দুই টাকা)

বাংলার নট, নাটক, নাট্যকার ও নাট্যশালার

অন্যতম পরম হিতৈষী

শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুত কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক

করকমলেষু—

—জীবানন্দ

মুখবন্ধ

অল্প ব্যয় এবং স্বল্প ঝামেলায় অভিনয় করা যায় এমন একখানি নাটক রচনার অনুরোধ একদা আসে বিখ্যাত সৌখীন সম্প্রদায় "রবিবারের আসরে"র কাছ থেকে। "এই আমাদের দেশ" সেই অনুরুদ্ধ নাটক। তারপর নাটকখানি "জাতীয় নাট্য-সঙ্ঘের" শিল্পীদের দ্বারা কোলকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে এবং মফঃস্বলের বহু স্থানে বিশেষ সমাদরের সঙ্গে অভিনীত হয়। নিছক গল্প-উপন্যাস রচনার পরিধি পার হয়ে নাটকের রাজত্বে এসে আজ যদি এতটুকুও স্থান সেখানে পেয়ে থাকি তবে তা এই শিল্পী-সুহৃদগণেরই অকৃত্রিম আন্তরিকতার গুণে। নাটকটির অভিনয় সাফল্য-মণ্ডিত কববার জন্য সঙ্ঘের আশু দাশ, কান্তি পাল, ধীরেন রায়, বলাই ঘোষ, শরৎ নস্কর ও নারায়ন কর্মকারের প্রাণান্তিক পরিশ্রম ও চেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাটকের দু'খানি গানের রচয়িতা হচ্ছেন কবি বিণয়ভূষণ দাশগুপ্ত। সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে নাটকখানি রচনা করেছি। অভিনয় করে' তাঁরা খুসী হলেই আমার আনন্দ, আমার তৃপ্তি।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৩
যাদবপুর
কলিকাতা-৩২।

জীবানন্দ ঘোষ

চরিত্র

মহিম চৌধুরী	:	জনৈক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ।
সুরেশ চৌধুরী	:	ঐ প্রথম পুত্র।
ধীরেশ চৌধুরী	:	ঐ দ্বিতীয় পুত্র।
বীরেশ চৌধুরী	:	ঐ তৃতীয় পুত্র।
অনাথ চৌধুরী	:	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
কল্যাণী	:	ঐ বিধবা কন্যা।
গণনাথ রায়	:	সুরেশের শ্বশুর।
নটবর দে	:	ঐ বন্ধু।
প্রাণেশ্বর মণ্ডল	:	ঐ ভৃত্য।
তপতী	:	ঐ কন্যা—সুরেশের স্ত্রী।
পুলক সেন	:	সৌখীন ডাক্তার।
বিভাস দাশগুপ্ত	:	তথাকথিত দেশসেবক।
বিশে	:	সিনেমা পাগলা কিশোর।
কমিরুদ্দি	:	পকেটমার।
চামেলী	:	নর্তকী।

-নন্দলাল, নরেন, বিজয়, ডাক্তার, শ্রীনাথ, গোবর্ধন, বিশ্বম্ভর, নিরঞ্জন প্রভৃতি।

জাতীয় নাট্য-সঙ্ঘের দ্বারা বহু অভিনীত রজনীর

একটি ভূমিকা-লিপি

মহিম—পূর্ণ ঘোষ।

সুরেশ—আশু দাশ।

ধীরেশ—রূপদর্শী।

বীরেশ—নন্দ ঘোষ।

অনাথ—মাষ্টার লক্ষ্মী।

গণনাথ—ধীরেন রায়।

নটবর—সমর দে।

প্রাণেশ্বর—কান্তি পাল।

পুলক—গোপাল ভট্টাচার্য।

বিভাস—জ্যোতি দাশ।

কমিরুদ্দি—মদন সেন।

বিশে—ননী পাল।

কল্যাণী—মায়া দেবী।

তপতী—রত্না মিত্র।

চামেলী—শেফালী সরকার।

ভোলা পাল, কানাই মান্না, ভোলা নস্কর, অমূল্য ঘোষ প্রভৃতি।

এই আমাদের দেশ

প্রথম অঙ্ক

[সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মহিম রঞ্জন চৌধুরীর ক্ষুদ্র উঠানে এখনও প্রভাত-সূর্যের আলো আসিয়া পড়ে নাই। ঘরের ভিতর হইতে মহিমরঞ্জনের একমাত্র বিধবা কন্যা কল্যাণী একরাশ উচ্ছিষ্ট থালা-বাসন লইয়া বাহির হইয়া উঠানে কলতলায় গেল। মহিমরঞ্জনের ছোট ছেলে অনাথ এখনও বিছানায় শুইয়া আছে। সেজ ছেলে বীরেশ ভোর হইতেই ফুটবল খেলার ব্যাপার লইয়া বাহির হইয়া গেছে। মেজ ছেলে ধীরেশ এই সংসারের একমাত্র কর্ণধার; রাত্রে সে কোন এক কারখানায় নাইট-ডিউটি করে, এখনও ফিরে নাই। বড় ছেলে সুরেশের সামনের ঘরের দরজা এখনও বন্ধ। মহিমরঞ্জন এক হাতে বাজারের থলে এবং অপর হাতে একটি লাঠি লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন।]

মহিম। (দেয়ালে টাঙানো মহাত্মাজীর ছবিকে প্রণাম করিয়া) আমার ইচ্ছা, আমার দেশের ইচ্ছা, আমার জাতির ইচ্ছা

পূর্ণ করো, পূর্ণ করো হে ভগবান! হ্যাঁ, তাহ'লে বাজারে চললুম মা কল্যাণী।

কল্যাণী। এসো! কিন্তু কী যে বাবা তুমি ওই বুড়ো লোকটাকে রোজ-রোজ প্রণাম করো—আমার ভালো লাগেনা।

মহিম। ও তুই বুঝবিনেরে মা, ও তুই বুঝবিনে! সে যুগে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, রাম-লক্ষ্মণ, ভীম-অর্জুন দেবতা,—এ যুগে দেশবন্ধু, মহাত্মাজী, বিবেকানন্দ প্রভৃতি হলেন সেই দেবতা। ও তুই বুঝবিনে!

কল্যাণী। ও বাপু আমার বুঝেও দরকার নেই। তুমি অনাথকে ডেকে দিয়ে বাজারে যাও!

মহিম। ছোট নবাবপুত্তুর বুঝি এখনও ওঠেননি? (সুরেশের বন্ধ দরজা দেখিয়া) ও! বড় নবাবপুত্তুর বুঝি কাল রাত্রে বাড়ী ফেরেননি?

কল্যাণী। কী করে' জানবো বলো? আমি তো আর সারারাত জেগে বসে' ছিলুমনা!

মহিম। বৌমা ওঠেনি?

কল্যাণী। জানিনে! অনাথকে ডেকে দিয়ে তুমি বাজারে যাও দিকি। ধীরেশের ফেরবার সময় হয়ে গেছে। এলেই তার আবার একটু চা চাই। আর বাজার থেকে কিছু সিঙাড়াও এনো।

মহিম। অনাথ! অনু!

অনাথ। (ভিতর হইতে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে) কী!

মহিম। উঠে পড়তে বস্। (কল্যাণীকে) হ্যাঁ, তাহ'লে আমি আসি। চললুম মা! (খানিকটা গিয়া) ইয়ে, ভালো কথা, শেষকালে কী যেন একটা আনতে বললি কল্যাণী! (পকেট হইতে

ফর্দ এবং পেনসিল বাহির করিয়া) কী বলতো মা, লিখে নিই—আমার আবার স্মরণশক্তি যা। কী যেন তেঁতুল না কী—! (কল্যাণী নিরুত্তর) তবে কী পেঁপে? (কল্যাণী নিরুত্তর) পল্‌তা?

কল্যাণী। আমার মাথা!

মহিম। এই ছাখো! ভুলেই না হয় গেছি, তা আর একবার বল্‌তে দোষটা কী!

কল্যাণী। না, তোমাকে আমি কিছু আন্‌তে বলিনি, তুমি যাও!

মহিম। বারে! এই তো বললি! কী যেন একটা খাবার জিনিষ আনতে বললিতো!

কল্যাণী। না, না, বাবা না, আমি তোমাকে কিছু আনতে বলিনি। বলি, সে কী আর একটা মানুষ, না তার কিছু খাবার সাধ-আহ্লাদ হয়, প্রত্যেকদিন চা খাওয়ার সময়ে সে বলে, দিদি, চায়ের সঙ্গে সিঙাড়া বেশ লাগে। এটা কী তোমরা কেউ দেখতে পাওনা, শুনতেও পাওনা?

মহিম। বেশ তো, ভালো তো, ধীরেশ সিঙাড়া খেতে চেয়েছে ভালো তো! এই আমি লিখে নিলুম (লিখিতে-লিখিতে) সিঙাড়া চার আনা। আচ্ছা তাহ'লে—

(কল্যাণী অকস্মাৎ হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখের জল মুছিল, তাহা দেখিয়া মহিমের 'আচ্ছা তাহ'লে—' আর শেষ হইলনা, তিনি প্রস্থান করিলেন। ঘর হইতে অনাথ একটি মাদুর ও বই লইয়া বাহির হইয়া রোয়াকে পড়িতে বসিয়া গেল।)

অনাথ। "বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন সিরাজদ্দৌলা—"

কল্যাণী। মুখ ধুয়েছিস ?

অনাথ। না। "তাঁহার নিকট হিন্দু-মুসলমান সমান ছিলেন।"

কল্যাণী। বলি মুখ ধুয়ে পড়তে বসবার কথাটা কী রোজ বলে দিতে হবে ?

অনাথ। "দেশের জন্য তিনি হাসিমুখে জীবন দিয়াছিলেন।"

কল্যাণী। অনু !

অনাথ। যাচ্ছি ! (দুম-দুম করিয়া গিয়া কলে মুখ ধুইয়া আসিল) হুঁঃ! এইরকম কানের গোড়ায় ভ্যাজ-ভ্যাজ করলেই আমার এগ্‌জামিনের পড়া হয়েছে।

কল্যাণী। এগ্‌জামিন কবেরে ?

অনাথ। জানিনে !

কল্যাণী। তা জানবে কেন ? তাহ'লে বছর-বছর ফেল্ করাটা হবে কেমন করে ? পর-পর ক' বছর হ'লো ?

অনাথ। পড়ার সময় বিরক্ত কোরো না ! (বইয়ের ভিতর হইতে একটি চিত্রাভিনেতার ছবি বাহির করিয়া স্বগতঃ) পর-পর তিন বছর ফেল্ করেছি, এবারেও নির্ঘাৎ ! বাবাও বলেছেন—এবার ফেল করলে ছাড়িয়ে দেবেন। বাস্, তারপর আর কী ! কেল্লা ফতে !

কল্যাণী। পড়ছিস্ ?

অনাথ। অঙ্ক কষছি। এখন বিরক্ত কোরোনা। (স্বগতঃ) ফিল্ম-এ্যাক্টর যদি একবার হতে পারি তো ব্যস্ ! ছবি বিশ্বাস, অশোককুমার, অহীন্ চৌধুরী তখন এই অনাথ চৌধুরীর কাছে নো হোয়ার ! সারা দেশকে পাগল করে ছাড়বো।

(প্রণাম করিয়া) হে মা সরস্বতী, এবারটাও আমাকে ফেল্ করিয়ে দিও মা !

কল্যাণী। (প্রণাম লক্ষ্য করিয়া সানন্দে) মা সরস্বতীকে ডাকছিস বুঝি অনু ? না, না, এবার তুই ঠিক পাশ করবি। আমিও তোর জন্যে শ' পাঁচ আনা মানৎ করে রেখেছি। দেখিস, এবার তুই ঠিক পাশ করবি।

অনাথ। (স্বগতঃ) জলে গেল, স্রেফ শ' পাঁচ আনা পয়সা জলে গেল ! আমি কোথায় চেষ্টা করছি ফেল করবার জন্যে তা নয় দিদি……ঈষ ! (প্রকাশ্যে) ওসব মানৎ-টানৎ আবার করতে গেলে কেন দিদি ?

কল্যাণী। তুই পাশ করবি বলে' !

অনাথ। পাশ করবার হ'লে ও এমনিই হবে। মিছিমিছি শ' পাঁচ আনা পয়সা—

কল্যাণী। ছি ! অমন কথা কী বলতে আছে ভাই ? আমাদের কত আশা তোর ওপর তা তুই কী জানবি অনু ? ধীরেশ তোকে মাঝখানে রেখে কত সুখের স্বপ্ন দেখে তা তুই কী বুঝবি ? দিবারাত্র সে পরিশ্রম করছে শুধু তোদেরই মুখ চেয়ে। বীরেশ, তুই মানুষ হবি, তার দুঃখ ঘোচাবি, তার পাশে এসে দাঁড়াবি - এই আনন্দেই সে প্রাণভরে খেটে যাচ্ছে—

অনাথ। (স্বগতঃ) সেরেছে ! মেজদার কথা উঠলেই দিদি ভুল বকতে সুরু করে। এই সুযোগে সরে পড়ি। আজ সকালেই মালির বাগানে একটা স্যুটিং আছে। যাই দেখি, যদি ভিড়ের মাঝখানেও একটা চান্স পাই।

(পা টিপিয়া-টিপিয়া প্রস্থান)

কল্যাণী। উদয়-অস্ত খেটেও যে নিজের আত্মাকে একটা পয়সা দেয়না, তোদের সকলের জন্যে যার দিনে-রাতে ঘুম নেই—সেই মানুষটার জন্যে তোদের কী এতটুকুও প্রাণ কাঁদেনা? এমন ভাই যে অনেক ভাগ্য করলেও পাওয়া যায়না রে অনাথ!

(মাতাল সুরেশকে ধরিয়া মহিমের প্রবেশ)

সুরেশ। আমাকে ছেড়ে দাও বাবা! আই কান্ট্ টলারেট্ দি গ্রাউলিং অফ্ দ্যাট্ ন্যাশন্যাল টাইগার—আই মিন্ ধীরেশ। তার চেয়ে বাবা সে বেরিয়ে যাক—

মহিম। কল্যাণী!

কল্যাণী। কী!

মহিম। এই ভাখ, বাজারের পথে রায়েদের বাইরের রোয়াকে সুরেশ পড়েছিল।

কল্যাণী। ভালো তো! অমূল্য রতন কুড়িয়ে এনেছো, সিন্দুকে তুলে রাখো!

সুরেশ। ঠিক বলেছিস। এক্‌জ্যাক্‌টলি সো! আমি অমূল্য রতন! কিন্তু ইডিয়েট বউটা বোঝেনা—

মহিম। (রোয়াকে বসাইয়া) এই রইলো। আমি বাজারে চললুম! [প্রস্থান]

সুরেশ। অমূল্য রতন। দি এক্‌জ্যাক্ট এ্যাডজেকটিভ্ ফর মি। বাট্ ফার্ষ্ট লেট্ মি নো—হোয়ার দি ন্যাশন্যাল টাইগার ইজ! কল্যাণী! ধীরেশটা কোথায় রে? বেরিয়ে গেছে?

কল্যাণী। না, এখনো ফেরেনি।

সুরেশ। দেন, আই ক্যান সিট হিয়ার ফর সাম……হ্যাঁ কিছুক্ষণ বসতে পারি। ইয়ে, কল্যাণী আমাকে তুই যেন কী একটা

বললি। কী…হ্যাঁ মনে পড়েছে। অমূল্য রতন। আমি অমূল্য রতনই তো! কিন্তু ওই ইডিয়েট্‌ বউটা আমাকে খারাপ করেছে। আমি মহিমরঞ্জন চৌধুরীর ছেলে, শিক্ষিত ছেলে—আমার বাবা আমাকে অনেক পয়সা ব্যয় করে বি-এ পাশ করিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি হয়েছি কী? হয়েছি একটা ফার্স্ট ক্লাশ গোট্‌—মানে একটা ছাগল। চমৎকার—চমৎকার পরিণতি! (ঝিমাইতে থাকিল)

কল্যাণী। এই হলো ধীরেশের সংসার! এদের মুখ চেয়েই সে খাটে।

(সুরেশের স্ত্রী তপতী দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া কলের দিকে আসিল।)

তপতী। এত বেলা পর্য্যন্ত এঁটো বাসন-পত্তর নিয়ে কল জোড়া করে রাখলে লোকে ঘুম থেকে উঠে কোথায় মুখ ধোবে ঠাকুরঝি?

কল্যাণী। তাও বটে। আমার হয়েছে বৌদি, আমি যাচ্ছি। (থালা-বাসন লইয়া হাতে তুলিল।)

তপতী। কল তোমাদের দু'টো করা উচিত ছিল। আমার বাপের বাড়ীতে চারটে কল!

কল্যাণী। (বাসন লইয়া যাইতে-যাইতে) সকলের বাড়ী তো আর সমান নয় বৌদি! আমার দাদার বাপের বাড়ীতে একটাই কল! [প্রস্থান]

তপতী। তা তো স্বচক্ষেই দেখছি। সারা দুনিয়ার এঁটো ভাত আর মাছের কাঁটার মাঝখানে মুখ ধুতে হচ্ছে! আমার বাপের বাড়ীতে এ রকম জঞ্জাল করে রাখলে ঝিকে তক্ষুনি জবাব দেওয়া হতো! (মুখ ধুইতে লাগিল)

[কল্যাণীর পুনঃপ্রবেশ]

কল্যাণী। কিন্তু আমার দাদার বাপের বাড়ীতে তো আর ঝি নেই বৌদি। এখানে ঝিয়ের কাজ যে করে, সে হ'লো অভাগী বিধবা বোন।

তপতী। সেইজন্তেই তো বেঁচে গেলে! ঝি যদি হতে—

স্বরেশ। এই—এই ইডিয়েট বউ—চুপ কর!

তপতী। (ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিয়া) তোমার সঙ্গে আমার কথা কইতেও ঘৃণা হয়! [প্রস্থান]

স্বরেশ। সাট্ আপ! তুই বড়লোকের মেয়ে আছিস তোর বাপের কাছে আছিস। এখানে যদি ফের ওরকম করে চেল্লাবি তো গুলি করবো। ইডিয়েট বউয়ের ফোটানি দেখনা!

কল্যাণী। দাদা চুপ করো। এক্ষুনি ধীরেশ আসবে!

স্বরেশ। ধীরেশ আসবে তো আমার কী! তাকে কী আমার ভয় করে চলতে হবে নাকি? আমি তার বড় ভাই—না?

কল্যাণী। কিন্তু সে খেটে-খুটে আসছে!

স্বরেশ। খাটছে, বেশ করছে। খুব খাটুক সে! না খাটলে আমাদের খাওয়াবে কী করে'? আমি মদখোর ভ্যাগাবণ্ড বড় ভাই, তুই বিধবা বোন, ধীরেশ নামকরা ফুটবল প্লেয়ার, অনাথ ইস্কুলে পড়ছে, বুড়ো বেতোরোগী বাবা আর ওই বড়লোকের মেয়ে। না খাটলে এসব সে ম্যানেজ করবে কেমন করে? খাটুক, খুব খাটুক!

কল্যাণী। কিন্তু তার মুখের দিকে কী তোমরা কেউ চাইবেনা?

স্বরেশ। চাইবোনা? আলবৎ চাইবো, একশোবার চাইবো!

কল্যাণী। কিন্তু সেটা কখন?

স্থরেশ। চাইবো যখন মদ খাওয়ার টাকা ফুরিয়ে যাবে, চাইবো যখন রেসের মাঠে হেরে যাবো।

কল্যাণী। এ কথা কী তোমার মুখে মানায় দাদা?

স্থরেশ। মানায় না মানায় সে আমি বুঝবো'থন! কিন্তু তুই ছোট বোন হয়ে আমাকে উপদেশ দিতে এলি? আমি বি-এ পাশ করা সুরেশ চৌধুরী—আমাকে উপদেশ দেবে বাংলা দেশের গণ্ডমূর্খ একটা বিধবা মেয়ে! (টলিতে-টলিতে উঠিয়া) আমি চলে যাবো। আমার মরণ ভালো!

কল্যাণী। উঠোনা! পড়ে যাবে দাদা! (ধরিতে যাইল)

স্থরেশ। ধরিসনি বলছি মুখপুড়ী, ছুঁসনি আমাকে! আমি তোদের বাড়ীতে আর থাকবোনা! (বাহিরের দরজার দিকে যাইতে উদ্যত)

কল্যাণী। (ধরিয়া) পড়ে যাবে দাদা, যেওনা! আমার অপরাধ হয়েছে, আর আমি তোমাকে কিছু বলবোনা।

স্থরেশ। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি! আমার কেউ নেই। আমি মাতাল, আমি বোম্বেটে! আমি ফুটপাতে বসবো।

কল্যাণী। রাস্তায় এই অবস্থায় বেরুলেই একটা কিছু অঘটন ঘটবে। (তপতীর ঘরের উদ্দেশ্যে) বৌদি, ও বৌদি, একবার বেরাও না ভাই! বড়দা যে…ও-বৌদি…

স্থরেশ। (ধাক্কা দিয়া কল্যাণীকে ফেলিয়া) গেট্ আউট্ গলগ্রহ কোথাকার! মহিম চৌধুরীর সংসারের জগদ্দল পাথর কোথাকার! গেট্ আউট!

কল্যাণী। (কপাল কাটিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকিল) মাগো!

সুরেশ। বিয়ে দেওয়া মাত্রই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ীতে উঠে বড় ভাইকে উপদেশ দেওয়া ? গেট্ আউট্ !

কল্যাণী। আমি তোমাদের গলগ্রহই দাদা। কিন্তু আমাকে বলে দাও, কী আমি করবো !

সুরেশ। কী করবি তা জানিস্‌নি মুখপুড়ী ? সুইসাইড করবি !… না সুইসাইড নয়, আত্মহত্যা করবি ! সুইসাইডে অনেক হাঙ্গামা !—সে সব বড়লোকদের একচেটে—আর্সেনিক, পটাসিয়াম—এ সব তুই জোগাড় করতে পারবিনে ! তার চেয়ে তুই আত্মহত্যা কর—কাপড়ে কেরসিন ঢেলে, অথবা কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি লাগিয়ে……দ্যাট্স্ বেটার ফর এ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সুইসাইড ইজ মোষ্ট ট্রাব্‌লসাম্ এ্যাণ্ড কষ্টলি টু।

কল্যাণী। বেশ তাই হবে। তাই-ই আমি করবো দাদা ! (উঠিল)

সুরেশ। হ্যাঁ তাই করবি। একজন তবু কমবে। ধীরেশের রোজগারে আমরা তবু সকলে একজনের ভাত ভাগ করে' বেশী খাবো !' (বসিয়া পড়িল)

কল্যাণী। (স্বগতঃ) ভগবান, নারায়ণ ! কী অপরাধে এত শাস্তি ! বাংলা দেশের বিধবাদের জন্যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই কী রাখোনি দয়াময় ? বেশ তাই যদি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়—

[বাহির হইতে ধীরেশ : 'দিদি ! দিদি' !]

কল্যাণী। কে তোর দিদি ধীরেশ ? যতদিন কুমারী ছিলুম, যতদিন তোদের কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, যতদিন তোদের নিজে না খেয়ে খাইয়েছি, ততদিন আমি তোদের দিদি

ছিলুম। ছোটবেলায় মা তোদের এতটুকু-এতটুকু রেখে চলে গেল, অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুললুম—তখন ছিল আমার বোন হবার দাবী, দিদি হবার জোর! কিন্তু আজ আমি তোদের কেউ নই, আজ আমি তোদের শত্রুর, তোদের গলগ্রহ!

[বাহির হইতে পুনরায় ধীরেশ : 'দিদি! ও দিদি!' এবং তারপরেই এক বোঝা বাজার লইয়া ধীরেশ প্রবেশ করিল। কল্যাণী তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরাইয়া লইল।]

ধীরেশ। বলিহারী তোমাদের কাণ্ড দিদি! চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে আমার গলা কাঠ হয়ে গেল—তবু যদি তোমাদের কারুর সাড়া পাবার জো আছে। এই রইলো বাজারগুলো, আমি আবার বাকীগুলো রিক্সা থেকে নামিয়ে নিয়ে আসি। [প্রস্থান]

সুরেশ। সরে' পড়ি বাবা—স্বদেশী বাঘটা এসে গেছে! কল্যাণীকে বোধহয় একটু ওভার ডোজ টরচার করে ফেলেছি। ধীরেশ শুনলে এক্ষুনি……তার চেয়ে বাবা সরে পড়ি! সারা পৃথিবীখানা এখনো সমানে আমার চোখের সামনে ঘুরছে, শেষে কথা কাটাকাটি হতে হতে একটা ইয়ে হয়ে যাবে! না বাবা, সরেই পড়ি! [প্রস্থান]

[ধীরেশের পুনঃপ্রবেশ, হাতে আর এক মোট বাজার]

ধীরেশ। কাল সারা রাত দিদি একটু চোখে-পাতায় করিনি। কারখানার শ্রমিকদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলছিল, তাই নিয়ে একটা দুর্দান্ত মিটিং করেছি। মালিকগুলোকে বুঝিয়ে দিয়ে এলুম—দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে—

তোমাদের জুলুম আর চলবেনা। জানো দিদি—আমাদের এই মধ্যবিত্ত—এই চাকুরীজীবিদের মধ্যে যা কিছু অশান্তি, যা কিছু বিপদ, তা এনে দিচ্ছে ওরাই—ওই টাকার কুমীর-গুলো। (কল্যাণীকে স্তব্ধ দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়ে) দিদি! ও দিদি!

কল্যাণী। কী!

ধীরেশ। আরে বাপু রাগ করেছো, আমি জানি, তা মুখটা ফিরিয়েই রাগ করোনা। কত আশা নিয়ে আমার গৌরবের কথাগুলো বলতে গেলুম, তা নয় মুখ ঘুরিয়ে আর একদিকে রইলে। এনেছি গো, এনেছি! অনেক কষ্টে থান তোমার জন্যে একখানা এনেছি। এই নাও। (একটি থান কাপড় বাহির করিয়া অদূরে রাখিল) বাব্বা! (আর একটি নূতন সার্ট বাহির করিয়া) আর এই সার্টটা হলো বড়দা তোমার। —নাও!…আরে, বড়দা তো এখানেই ছিল, না? কোথায় গেল? দিদি!

কল্যাণী। (স্বগতঃ) ওরে আমার সোনার ভাইরে!

ধীরেশ। বারে! তুমি কী আজ ওরকম চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকবে দিদি?

কল্যাণী। না, এই যাচ্ছি ভাই! (পুনরায় কপাল এবং চোখ মুছিবার চেষ্টা করিতে থাকিল।)

ধীরেশ। নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে। তুমি তো আমার সাড়া পাবার পর চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকবার মানুষ নও দিদি! বলো, কী হয়েছে! (রক্তাক্ত কপাল দেখিয়াই) এঁ্যা!

রক্ত—রক্ত কেন তোমার কপালে? জল কেন তোমার চোখে? দিদি! দিদি!

কল্যাণী। ও কিছু না, কিছু না ধীরেশ। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) হ্যাঁরে, কী এসব এনেছিস, কই দেখি।

ধীরেশ। ওসব থাক, কী হয়েছে আগে বলো।

কল্যাণী। কিছু হয়নি ভাই। আয়, তুই হাত-মুখ ধুবি আয়। চা চড়িয়েছি। বাবা তোর জন্যে সিঙাড়া আনতে গেছেন।

ধীরেশ। আমাকে ভোলাবার চেষ্টা কোরনা দিদি! রক্ত-রাঙা কপাল আর চোখভরা জল নিয়ে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা কোরনা —কী হয়েছে আগে বলো।

কল্যাণী। কী হবে আবার? কলতলায় পড়ে গিয়েছিলুম, কপালটা একটু কেটে গেছে।

ধীরেশ। আর 'চোখে জল কেন'—জিজ্ঞেস করলে বলবে কুটি পড়েছে —এই তো? বেশ! বেশ! আমাকে লুকিয়ে, আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা তোমাদের সংসার চালাতে চাও— চালাও! আমি এই চললুম। পোড়া সংসারের মন জুগিয়ে চলার চাইতে আমার দশের সেবা করা ঢের—ঢের ভালো! [প্রস্থানোদ্যত]

[তপতীর প্রবেশ]

তপতী। বোন তোমার ঢাকবার চেষ্টা করছে গো ঠাকুরপো, বড় ভাইকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

কল্যাণী। বৌদি!

তপতী। বাধা দেবার চেষ্টা কোরনা ভাই ঠাকুরঝি! ষাট কথা বলবো, হক কথা বলবো—তা সে স্বামীই হোক আর যে-ই হোক। আমার বাপের বাড়ীর শিক্ষাই এমন।

কল্যাণী। কিন্তু সেই হক কথাটা পরে বললেও তো চলতো বৌদি।

ধীরেশ এই সবে এলো।

ধীরেশ। না, না এর মানেটা কী?

তপতী। মানেটা পরেই শুনো ভাই ঠাকুরপো। আর তোমাদের ভাই-বোনের ব্যাপারে আমার থাকাও উচিত নয়।...উঃ, যে ধাক্কাটা দিলে!

ধীরেশ। ধাক্কা! কাকে কে ধাক্কা দিলে? বড়দা বুঝি দিদিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে?

তপতী। পরেই শুনো ভাই। ছোটলোকের কেচ্ছা কাণ্ড বলতে আমার মুখেও বাধে।

কল্যাণী। মুখে যখন বাধে, তখন ওই অসুস্থ শরীরে কেন কষ্ট করছো বৌদি? তুমি ঘরে গিয়ে শোওগে, আমি তোমার চা দিয়ে আসছি।

তপতী। ও! তা বেশ! কিন্তু আমার বাপের বাড়ীতে হলে—[প্রস্থান]

ধীরেশ। বুঝেছি মাতলামি করে' বড়দা তোমাকে মেরেছে। কোথায় বড়দা? বড়দা! বড়দা!

কল্যাণী। দোহাই ধীরেশ! জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে একটু চা খা ভাই!

ধীরেশ। এর একটা বিহিত না করা পর্য্যন্ত আমি আজ জলগ্রহণ করবো না। কোথায় গেল বড়দা? একটু আগে তো এখানেই ছিল!—বড়দা!

কল্যাণী। পাগলামি করিসনে ধীরেশ! বাংলা দেশের একটা গরুরও অধম এই বিধবা—তাদের জন্যে কেন এরকম পাগলামি করছিস ?

ধীরেশ। ও সব বড়-বড় কথা আমি শুনতে চাইনা। আমি জান্তে চাই—কিসের জন্যে বড়দা তোমাকে মারবে? বড়দা বাইরের দিকে আছে বুঝি ? [প্রস্থানোদ্যত]

কল্যাণী। যাসনে—যাসনে ধীরেশ! আমাকে মাঝখানে রেখে যদি এরকম একটা কেলেঙ্কারী করিস—তাহ'লে—

ধীরেশ। তাহ'লে কী ?

কল্যাণী। তাহ'লে আমি মরবো।

ধীরেশ। মরবে! মরবে মানে ?

কল্যাণী। মানে গলায় দড়ি দেবো, আফিম খাবো। এখন তুই এদিকে আয় দিকি !

ধীরেশ। (আসিয়া) আমি বোকা বলে, মুখ্যু বলে' কেউ তোমরা আমাকে ভালোবাসোনা!

কল্যাণী। ভালোবাসিনা ?

ধীরেশ। বাসোনা তো! ভালোবাসলে বড়দা তোমাকে মারতে পারতো, তুমি আমাকে মরবার ভয় দেখাতে পারতে! কিন্তু এও আমি তোমাকে বলে' রাখলুম দিদি—আমি যদি ঠিক মহিম চৌধুরীর ছেলে হই তাহ'লে একদিন আমি ঠিক চলে' যাবো, কারুর কথা শুনবোনা—হ্যাঁ!

কল্যাণী। হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে নে ধীরেশ! (এক ঘটি জল আনিল)

ধীরেশ। (রক্তাক্ত কপাল দেখাইয়া) কিন্তু ওই কপালের দিকে চেয়ে

আমি চা খাই কী করে'? বলি ওখানে একটা ন্যাকড়া বাঁধতে বল্‌লেও কী ধীরেশ অপরাধী হবে?

কল্যাণী। (চা আনিয়া) আচ্ছা পাগলকে নিয়েই পড়েছি। কথায়-কথায় চোখে জল আর জোর জুলুম। আচ্ছা বাবা, বাঁধছি। চা-টা তুই খেয়ে নে ততক্ষণ! [প্রস্থান]

ধীরেশ। (চোখ মুছিতে-মুছিতে) আমার কী চোখে জল থাকে না আমি একটা মানুষ! ভগবান কেবল গতরখানা দিয়েছে, তাই রাতদিন খেটেই যাচ্ছি।

[মুখ ধুইতে থাকিল। কল্যাণী ঘরের ভিতর হইতে কপাল বাঁধিয়া প্রবেশ করিল। ধীরেশ চায়ের কাপটা হাতে তুলিল। কল্যাণী একটি বঁটি ও শাক-শব্জী লইয়া কুটনা কুটিতে বসিল।]

কল্যাণী। (বাহিরের দিকে চাহিয়া) বাবা এখনো ফিরলোনা।

ধীরেশ। (চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাইবে—এমন সময়) বাবা! কোথায় গেছে বাবা?

কল্যাণী। বাজারে।

ধীরেশ। তা এই সাত-তাড়াতাড়ি সেই বুড়ো লোকটাকে বাজারে না পাঠালে কী তোমাদের আজ হাঁড়ি চড়তো না দিদি? পাঁচশো দিন বারণ করেছি······দ্যাখো দি'কি!······কেন, বীরেশকে পাঠাতে কী হয়েছিল? বলি, আমিও তো ফিরে এসে যেতে পারতুম।

কল্যাণী। অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? বাবা এই এলো বলে'।

ধীরেশ। ব্যস্ত হচ্ছি কেন? বুড়ো মানুষটা···গাড়ী-ঘোড়ার পথ—যদি ···না, না···খেলে—সকলে মিলে আমাকে খেলে!

কল্যাণী। কোন ভয় নেই, বাবা ঠিক ফিরে আসবেএখন।

বীরেশ। বীরেশটা কোথায় ?

কল্যাণী। ভোর বেলাতেই ফুটবল নিয়ে বেরিয়েছে।

বীরেশ। আর অনাটা ?

কল্যাণী। সে তো এখানেই পড়ছিল! কোথায় গেছে হয়তো!

বীরেশ। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি! গাড়ীচাপা পড়ার আজকাল ভয়ানক হিড়িক পড়েছে— (প্রস্থানোদ্যত)

কল্যাণী। তা চা-টা খেয়েই যা-না।

বীরেশ। চা তুমি তুলে রেখে দাও দিদি! বুড়ো বাবা রইলো বাইরে, আর আমি নিশ্চিন্ত মনে বসে' আরাম করে' চা খাবো! আমি চললুম! [প্রস্থান]

কল্যাণী। হায়রে! এমন মানুষটাকেও কেউ চিনলে না!

[বীরেশের প্রবেশ ; হাতে তার একখানি খবরের কাগজ ; কাগজ পাঠ করিতে-করিতে প্রবেশ]

বীরেশ। "বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী দল মোহনবাগানের শোচনীয় পরাজয়" ......"শেষ মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে পর-পর দুইটি গোলের দ্বারা পরাজয় বরণ—।" (কাগজ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া) ড্যাম ফেলিওর—এ্যাব্‌সলিউটলি হোপলেশ্‌! সারা বাংলা দেশ কত আশা নিয়ে মোহনবাগানের দিকে চেয়ে আছে আর সে কী না একেবারে দু'টো গোল খেলে—ওই হতচ্ছাড়া ফিরিঙ্গি দলের কাছ থেকে! ঈষ.! মানুষ কাকে বিশ্বাস করবে? দিদি! দিদি!

কল্যাণী। কী হয়েছে ?

বীরেশ। তুমিই বলো! মোহনবাগান— সারা বাংলার গৌরব—সারা

যুবকমহলের প্রাণ যে মোহনবাগান—সেই মোহনবাগানের এরকমভাবে হারাটা কী উচিত হয়েছে ? (হাতের চেটোর উপর দেখাইয়া) ফার্ষ্ট রাউণ্ডে কী একটা নতুন দলকে হারিয়ে যখন ফিরিঙ্গি দলটা সেকেণ্ড রাউণ্ডে উঠলো, ভাবলুম এবার বাছাধন কালীঘাটের কাছে মাথা নোয়াবে, কিন্তু সেখানেও টপকে যখন থার্ড রাউণ্ডে উঠলো তখন একেবারে ঠিক করে নিলুম—মোহনবাগানের কাছে কমসে কম হাফ্ ডজন গোল খেয়ে, রাজপুত্তুররা দেশে ওঠবার জাহাজের টিকিট কাটবে—কিন্তু—কিন্তু তার বদলে—এ কী হ'লো! সাত সমুদ্দুর তের নদী টপকে এসে, ওরা যে আমাদের মুখে চুণ কালি দিয়ে গেল দিদি। উঃ! মোহনবাগান কী করলে!

কল্যাণী। ধীরেশ বাড়ী এসেছে। তোর মোহনবাগান এখন তুলে রাখ।

বীরেশ। মেজদা এসেছে! কোথায়?

কল্যাণী। বাবাকে খুঁজতে গেল। তোরা থাক্তে বুড়ো বাবাকে বাজারে যেতে হয়—এই নিয়ে ধীরেশ আজ বড্ড বকাবকি করেছে।

বীরেশ। বাবার ওই একটা বদ্ ইয়ে! নিজেই তো যায়!...(স্বগতঃ) কিন্তু বাড়ীতে থাকলে আমার ওপরও বোধকরি একচোট হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে কেটে পড়ি। মেজদার ওই ষাঁড়ের মত চীৎকার—ও বাবা আমি মোটেই হজম করতে পারিনা। [কাগজটি কুড়াইয়া প্রস্থান]

কল্যাণী। বীরেশ! চা হয়ে গেছে, খেয়ে যা!

বীরেশ। (বাহির হইতে) মেজদা বেরিয়ে গেলে আস্বো'খন।

[কল্যাণীর প্রস্থান]

[সুরেশকে টানিয়া ধীরেশের প্রবেশ]

সুরেশ। ছেড়ে দে! আমার হাত ছেড়ে দে ধীরেশ!

ধীরেশ। (ছাড়িয়া) ছাড়লুম। কিন্তু বলো. কেন তুমি ওরকমভাবে রাস্তায় শুয়েছিলে?

সুরেশ। আমার অভিমান হয়েছিল বলে'। কল্যাণী ছোট বোন হয়ে আমাকে উপদেশ দিতে এলো কেন?

ধীরেশ। তোমার মত জ্ঞানী-শিক্ষিত লোককে উপদেশ দিতে আসা দিদির খুবই অন্যায় হয়েছে!

সুরেশ। তবে? আমি বি-এ পাশ করা ছেলে—আমাকে যদি কেউ উপদেশ দিতে আসে—তাতে আমার সম্মান হানি হয়না? তাই রাগের মাথায় ওকে একটা ধাক্কা দিয়েছি—

ধীরেশ। ধাক্কা দিয়েছো! দিদিকে তুমি ধাক্কা দিয়েছো?

সুরেশ। হাঁা দিয়েছি তো! শাসন করেছি।

ধীরেশ। কথা কইতে তোমার লজ্জা করেনা দাদা? একগাদা পয়সা খরচ করে' বি-এ পাশ করে' বেকার হয়ে বসে' দিবারাত্র মদ গিলছো, তাতেও তোমাকে কিছু বলিনি। কিন্তু এসব কী সুরু করেছো? কিসের জন্যে তুমি দিদিকে মারবে?

সুরেশ। এই—এই ধীরেশ। সুরটা নরম কর—কেঁদে ফেলবো।

ধীরেশ। মাতলামি রেখে দাও দাদা। বলতে পারো, কী সুখে আমি সংসার করবো? কিসের টানে আমি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটবো? এই তো আমার সংসার—এই তো আমার সংসারের মানুষ!

সুরেশ। আমি তোর বড়ভাই ধীরেশ। সম্মান রেখে কথা বল্। কেঁদে ফেলবো।

ধীরেশ। চুপ করো! (অর্ধ স্বগতঃ) আমরা চার ভাই—ইচ্ছে ছিল তিন ভাই সংসার নিয়ে মেতে থাকবে আর আমি একটু দেশের কাজ করবো। কিন্তু তা হলো না—এরা তা হতে দিলেনা। আর এদেরই বা দোষ কী—চল্লিশ কোটি মানুষ নিয়েও যেদেশ এখনও স্বাধীনতার স্বাদ পূর্ণরূপে পেলো না—সে দেশের মানুষ এরকম লক্ষীছাড়া, হতচ্ছাড়া ছাড়া আর কী হতে পারে? লজ্জা—লজ্জা—উঃ, কী লজ্জা!

সুরেশ। আমি কী তাহ'লে একটু বাইরের খোলা হাওয়ায় গিয়ে বসবো ধীরেশ? (উঠিল)

ধীরেশ। না। এইখানে বসো। আমি বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছি—না ফেরা পর্য্যন্ত চুপটি করে এখানে বসে' থাকবে। বুঝেছো?

সুরেশ। হ্যাঁ। তুই যা!

[ধীরেশের প্রস্থান]

[রোয়াকে ভালো করিয়া বসিল সুরেশ।]

সুরেশ। ভ্যাজ-ভ্যাজ করে খুব খানিকটা লেকচার দিয়ে গেল। পরাধীন হয়ে থাকার কী যে সুখ তা তো জানেনা। যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি—এই তো সব কত কী হোল্ ওয়ার্ল্ডে আজএকটা না একটা কিছু লেগেই আছে—কিন্তু পরাধীন ভারতের অধিবাসী হয়ে কেমন খুস মেজাজে দিব্যি দিন কাটাচ্ছিলুম বলাদি'নি? স্বাধীনতা! না, না সাহেব, খাঁটি স্বাধীনতাটা আমাদের দিও না—এই জোলো স্বাধীনতাই ভালো। বাদশাহী সুখ এখনও যা ভোগ করছি সত্যিকারের স্বাধীনতা কাঁধে ভর করলে তাও চিচিং ফাঁক! এ বাবা বেশ আছি। (হেঁচকি উঠিতে থাকিল) এ যে বাবা হেঁচকি

উঠছে। একটু জল। (কাহাকেও না দেখিয়া ঈষৎ উচ্চৈস্বরে) একটু জল। (খানিক পরে) কল্যাণী! কল্যাণী!

[কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী। কী দাদা?

সুরেশ। একটু জল দে। (কল্যাণী জল আনিতে গেলে) শেষের দিকটা অভাবে পড়ে খানিকটা ধেনো চালিয়েছিলুম, তাই নেশাটা এখনো সমানে রয়েছে।

কল্যাণী। (জল আনিয়া) এই নাও দাদা।

সুরেশ। দে। (গ্লাশ লইতে গিয়া কল্যাণীকে দেখিয়া) ও কী? কপালে ফেট্টি বেঁধেছিস কেনরে?

কল্যাণী। ও কিছু না দাদা। (কল্যাণী মুখ ঘুরাইয়া প্রস্থানোদ্যত)

সুরেশ। যাসনে কল্যাণী, দাঁড়া—বুঝেছি।…কল্যাণী!

কল্যাণী। কী দাদা?

সুরেশ। অত মধুর করে' কেন কথা কইছিস কল্যাণী? তোর কপালে আমি রক্তের দাগ দিয়ে দিলুম—আমাকে তুই গাল দেনা, বল্‌না—জীবনে কখনো এ মুখ আর তুই দেখবিনি।

কল্যাণী। আমার গুরুজন তুমি—প্রণামের মানুষ তুমি, তোমায় আমি কেমন করে কটু কথা বলবো দাদা? (প্রণাম করিল)

সুরেশ। ওরে, আমি কবে—কবে মানুষ হবোরে? তোর মত বোন যার, ধীরেশের মত ভাই যার—সে দুনিয়ায় মানুষ নামে পরিচিত হতে পারলোনা—এ লজ্জা আমার কবে ঘুচবে, বলতে পারিস কল্যাণী?

কল্যাণী। আমি তোমার চা আনি, দাদা। [প্রস্থান]

সুরেশ। ছিলুম মানব-শিশু, হয়েছি দানব পশু। এই পশুত্বের অবসান আমার কবে হবে ভগবান?

(দুই হাতে দুই কাপ চা লইয়া কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। চা-টা খেয়ে নাও দাদা।

সুরেশ। দে। (চা পান করিতে-করিতে) কিন্তু আমি একটা কী!

কল্যাণী। বৌদি! বৌদি!

(তপতীর প্রবেশ)

তপতী। (দরজা খুলিয়া ক্রুদ্ধস্বরে) কী-হ!

কল্যাণী। তোমার চা বৌদি!

তপতী। দাও! (চা লইয়া) আচ্ছা ঠাকুরঝি, তোমাদের এহ কেচ্ছা-কাণ্ড কী একটু থামবে না? দেখছো আমি অসুস্থ—কাল বিকেল থেকে সমানে মাথাটা ধরে' রয়েছে—তোমাদের কী একটু বিবেচনা শক্তিও নেই? আমার বাপের বাড়ীতে হলে—

কল্যাণী। বড় লোকে আর গরীব লোকে যে তফাৎ, শিক্ষিত আর মুখ্যুতে সেই তফাৎ। আমরা গরীব তার ওপর মুখ্যু—আমাদের বিবেচনা শক্তি একটু কমই বৌদি!

তপতী। বিবেচনা শুধু এদিক দিয়ে কেন, বিবেচনা তোমাদের অনেক দিক দিয়েই নেই ঠাকুরঝি।

কল্যাণী। তুমি আমার গুরুজন, তাই তর্ক আমি করতে চাইনে। কিন্তু ওরকম করে শ্বশুর কূলকে ধরে গালাগালি দিওনা বৌদি, পাপ হবে।

তপতী। পাপ পুণ্যের কথা আমার বেশ জানা আছে। বিয়ের আগে

বাবা আমাকে কলেজে পড়িয়েছিলেন তা মনে রেখে আমাকে উপদেশ দিতে এসো।

কল্যাণী। আমাকে ক্ষমা করো বৌদি। গেরস্থর সংসারে সকাল বেলাতেই এরকম করাটা—

তপতী। থামো! কোনটা পাপ, কোনটা পুণ্য, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ—তা আমি বেশ জানি। বলতে পারো—তোমার মাতাল, চরিত্রহীন দাদা আমার প্রতি যে ব্যবহার করে—সেটা তোমাদের বিচারে কোন দলে পড়ে?

কল্যাণী। দাদা আমার গুরুজন, তাঁর কাজের বিচার করবার মত শক্তি আমার নেই বৌদি! [প্রস্থান]

সুরেশ। এইও! এইও ইডিয়েট্ বউ! গুলি করবো! ইডিয়েট্, আমি মাতাল, আমি চরিত্রহীন? মাতাল আমি হলেও হতে পারি, কারণ আমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে,—কিন্তু চরিত্রহীন আমাকে বলে কোন নন্‌সেন্স?

তপতী। (চায়ের কাপ রাখিয়া) প্রায় রাত্রি যার বাইরে কাটে তাকে চরিত্রহীন না বলে' সাধু বলে' চরণামৃত খেতে হবে, এমন শিক্ষা আমার বাবা আমাকে দেননি।

সুরেশ। ওই—ওই গুমোর—ওই বড়লোক বাপের গুমোরে তুই এতো নীচে নেমে গেছিস স্টুপিড যে নিজের স্বামী বস্তুটাকে চেনবার মত চোখ দু'টোও তুই খেয়ে বসেছিস। চরিত্রহীন! চরিত্রহীন আমি নই। একদিন যে সুরেশ চৌধুরী স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে জীবনের পথে চলবার সঙ্কল্প করেছিল, আজ সেই সুরেশ চৌধুরী যদি তোদের চোখে অমানুষ, অকেজো হয়ে দেখা দেয়, জানিস তার জন্তে একমাত্র দায়ী তুই!

তপতী। আমি !

সুরেশ। হ্যাঁ তুই ! আমার ফুলের মত জীবনকে, আমার আকাশ-ছোঁয়া আকাঙ্খাকে, আমার পবিত্র আদর্শকে ভেঙে-চুরে তুই আমাকে পশু করে তুলেছিস ! অশান্তির হলাহলে আমাকে তুই নীলকণ্ঠ করে' তুলেছিস শয়তানী !

তপতী। সে বরং আমার হয়েছে। আমার সমস্ত শিক্ষার গর্ব, জ্ঞানের দম্ভ সব—সব চূর্ণ হয়েছে তোমার মত মানুষকে স্বামীত্বে বরণ করে'। উঃ, আগে যদি জানতুম তোমার পরিণতি—এই ; এই মদখোর মাতাল রূপই তোমার আসল রূপ—তাহ'লে কে—কে দিত তোমায় আমার মত মেয়েকে স্ত্রী বলবার অধিকার ? [প্রস্থান]

[সুরেশ তপতীর যাওয়ার পথের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শুষ্ক হাসিয়া —]

সুরেশ। বাইরের লোকও তাই জানে বটে ! তারা জানে—আমি মাতাল, তারা দেখে—আমি একটা লোফার, তারা বলে—বি-এ পাশ করা ছেলেটা গোল্লায় গেল। কিন্তু কেন সে গোল্লায় গেল, সেটা কী কেউ দেখেছে ? কেউ কী দেখেছে কত সুখের আমার বিবাহিত জীবন ? তারা কেবল দেখেছে আমার বউ সুন্দরী, কিন্তু তারা কী দেখেছে তার ভেতরটা কত কুৎসিৎ ? মানুষ কেন মদ খায়- এ কারণটা আবিষ্কার করবার জন্যে আজ পর্য্যন্ত কেউ কী চেষ্টা করেছে ?

(বাজার লইয়া মহিমরঞ্জনের প্রবেশ)

মহিম। কল্যাণী ! মা কল্যাণী !

কল্যাণী। (ভিতর হইতে) যাই বাবা।

মহিম। (বাজার রাখিয়া বসিয়া) এই যে সুপুত্তুর আমার। এখনো ঝিমুচ্ছো বাবা ?

সুরেশ। আমাকে বলছো বাবা ?

মহিম। তোমাকে ছাড়া আর আমার কোন ছেলেকে সুপুত্তুর বলবো বাবা ?

সুরেশ। আমাকে বুঝি ঠাট্টা করছো বাবা ? আমি মদ খাই বলে' আমাকে বুঝি টন্ট্ করছো ?

মহিম। না বাবা, ঠাট্টা করিনি। কল্যাণী !

সুরেশ। সুপুত্তুর আমি হতে পারতুম—তা জানো ? কিন্তু তুমিই আমাকে হতে দাওনি।

মহিম। মাতলামি রাখ সুরেশ। লজ্জা করেনা বাপের সামনে মাতলামি করতে !

সুরেশ। ইস্কুল থেকে সুরু করে' কলেজ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত যে সুরেশ চৌধুরী একবারের জন্যেও কখনো এগ্জামিনে ফার্ষ্ট ছাড়া সেকেণ্ড হয়নি,—যাকে দেখে এককালে পাঁচজনে অনেক কিছু আশা করেছিল—সেই সুরেশ চৌধুরীর এমন পরিণতি হবে—কেউ কী কল্পনা করতে পেরেছিল ?

মহিম। লেকচার থামা সুরেশ, সব সময় ভালো লাগেনা। মা কল্যাণী !

সুরেশ। লেকচার নয় বাবা। আজ আমার এই পরিণতির জন্যে তুমিও কম দায়ী নও। একগাদা টাকার লোভে কিসের জন্যে তুমি আমাকে ওই বড়লোকের মেয়েটার বাপের কাছে বিক্রী করলে ? সামান্য দু' হাজার টাকার লোভে তুমি আজ আমার কী সর্বনাশ করলে—একবার ভাবো তো ?

মহিম। তোর বিয়ে দিয়ে আমি তোর সর্বনাশ করেছি, সুরেশ ?

সুরেশ। নিশ্চয়ই। আমার বিয়ে দিয়ে তুমি দু' হাজার টাকা পেয়ে তোমার দেনা শোধ করলে। কিন্তু আমি কী পেলুম ? আমি পেলুম সারা জীবনের জন্তে বুকজোড়া অশান্তি।

মহিম। চুপ কর ! বাপের সঙ্গে কথা কইছে শ্যাখোনা। কল্যাণী ! কী করছিস মা ?

(হাত মুছিতে-মুছিতে কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। কী বাবা ?

মহিম। কখন থেকে ডাকছি—কী করছিলি ?

কল্যাণী। ভাত চড়ালুম। ধীরেশ আবার খেয়ে বেরুবে তো !

মহিম। ধীরেশ ফিরেছে ? কোথায় সে ?

কল্যাণী। (বিস্ময়ে) তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়নি ? সে তো তোমাকেই খুঁজতে গেল !

মহিম। (কল্যাণীর দিকে চাহিয়া) আমাকেই খুঁজতে ? কিন্তু— কিন্তু তোর কপালে কী ? কপাল তোর বাঁধা কেন কল্যাণী ?

কল্যাণী। (শিহরিয়া স্বগতঃ) সর্বনাশ ! কী বলি বাবাকে এখন ! ধীরেশের যত সব কাণ্ড !

মহিম। কল্যাণী ! কী হয়েছে কপালে ?

(সুরেশ এই সময় লুকাইয়া পলাইতে গেল)

মহিম। কোথায় যাচ্ছিস ? বোস্ এখানে ! (হাত ধরিয়া বসাইলেন) কী হয়েছে, বল কল্যাণী।

কল্যাণী। কিছু হয়নি বাবা। কলতলায় পা হড়কে একটু···তাই মানে

ধীরেশ জোর করে' বাঁধতে বল্‌লে……নইলে বাঁধবার মত তেমন কিছু হয়নি বাবা। মানে—

মহিম। মানে তোর রেখে দে কল্যাণী। বুঝেছি, কী হয়েছে। সুরেশ!

সুরেশ। (ভীতভাবে) আমি—আমি কিছু জানিনা বাবা। কী রকম করে' হঠাৎ কী হয়ে গেল। আমি—আমি ইচ্ছে করে' ধাক্কা দিইনি বাবা!

মহিম। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) হুঁ!

সুরেশ। তুমি তো জানো কল্যাণীকে আমি কত ভালোবাসি! ও-আমার মা'র পেটের বোন!

কল্যাণী। না বাবা, দাদার কোন দোষ নেই। আমিই পা হড়কে পড়ে' গিয়েছিলুম। তেমন লাগেওনি, বাবা।

সুরেশ। মা যখন অনাথকে দু'মাসের রেখে মারা গেল, তখন কল্যাণী আর আমি দু'জনে মিলে ধীরেশ, বীরেশ আর অনাথকে মানুষ করেছি। কল্যাণীকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি। তুমি বিশ্বাস করো বাবা, ওকে আমি মারতে পারিনা।

[মহিমরঞ্জন প্রস্তরমূর্তির ন্যায় চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় ধীরেশ হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একটুকরো কাগজ।]

ধীরেশ। দিদি! দিদি! বাবা এসেছে?

কল্যাণী। হাঁ এসেছে। এই তো।

ধীরেশ। বাবা! দাদার কীর্তি দেখেছে? একে তো দিদিকে মেরেছে—

কল্যাণী। ধীরেশ!

ধীরেশ। তুমি বাধা দেবার চেষ্টা কোরনা দিদি! হ্যাঁ, একে তো দিদিকে মেরেছে, তার ওপর—

কল্যাণী। ধীরেশ! তোর চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

ধীরেশ। জাহান্নামে যাক তোমার চা! হ্যাঁ তার ওপর এই ছাখো— রপ্তে-রপ্তে দাদা কত জায়গায় টাকা ধার করেছে। (কাগজ দেখাইল) তোমাকে বাজারে খুঁজতে যাওয়ার পথে দেখলুম, দল বেঁধে এরা বাড়ীতে তাগাদা করতে আসছে। এক তো মদের দোকানেই একশো বাট টাকা তেরো আনা।

কল্যাণী। ধীরেশ! তোর অফিস যাবার বেলা হয়ে গেল।

ধীরেশ। (মহিমকে) এই পাচশো-সাড়ে পাঁচশো টাকা আমি কোত্থেকে শুধবো বলতে পারো?

মহিম। সুরেশ!

সুরেশ। আজ্ঞে!

মহিম। তোমার অনেক অত্যাচার আমি আজ পর্য্যন্ত মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু আর আমি করবোনা। তুমি এই মুহূর্তে আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও।

কল্যাণী। বাবা!

ধীরেশ। বাবা!

মহিম। কারুর কোন কথা আমি শুনবোনা। আমি জানবো— আমার চার ছেলের মধ্যে এক ছেলে মরেছে!

কল্যাণী। বাবা! এ তুমি কী বলছো বাবা? দাদা যে তোমার বড় আদরের—

মহিম। শুধু বড় আদরেরই নয় সে, বড় আশারও বটে! কিন্তু আজ

সে আমার সেই আশার মুখে ছাই দিয়ে নিজে হাতে আদরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বাপ হয়ে কত দুঃখে, কত কষ্টে ছেলের মৃত্যু-কামনা করছি তা তোরা বুঝতে পারবিনে।

ধীরেশ। কিন্তু এমন কঠোর শাস্তি তুমি দাদাকে দিওনা, বাবা!

মহিম। সুরেশ, গেলে? আর তুমি যদি না যাও—

ধীরেশ। বাবা।

মহিম। কতদিন না খেয়ে, কত রাত্রি না ঘুমিয়ে, কত দুঃখ-বেদনা সহ্য করে' মানুষ করেছি—বি-এ পাশ করিয়েছি ওই ছেলেকে। দিনের পর দিন যত ও বড় হয়েছে, আমিও মনের মধ্যে স্বার্থপরের মত আশার বোঝাকে বাড়িয়ে চলেছিলুম। কত আনন্দের ছবি এঁকেছিলুম মনের মধ্যে। কিন্তু পেলুম কী?

সুরেশ। আমাকে ক্ষমা করো বাবা!

মহিম। কোন ক্ষমা নেই! মহিমরঞ্জন চৌধুরীকে লোকে এক কথার মানুষ বলেই জানে। তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র!

কল্যাণী।
ধীরেশ। } বাবা!

সুরেশ। (ধীরে ধীরে উঠিয়া) বেশ! আজ থেকে আমি মহিমরঞ্জন চৌধুরীর ছেলে নই। আজ থেকে আমি এ বাড়ী হতে নির্বাসিত। আমি চল্‌লুম!

(কল্যাণী ও ধীরেশ কাঁদিতে থাকিল)

সুরেশ। কাঁদিসনে কল্যাণী, কাঁদিসনে ধীরেশ! যাবার সময় তোদের চোখে জল দেখলে আমি যে যেতে পারবোনারে!

ধীরেশ। দাদা! তুমি যেওনা দাদা! দা—দা—

সুরেশ। না, আমাকে যেতেই হবে! আমার জন্যে অনাহার অপেক্ষা করছে, আমার জন্যে মৃত্যু হাতছানি দিচ্ছে, আমাকে যেতেই হবে। বাবা, একটু পায়ের ধূলো দাও! (পায়ের ধূলা লইল)

কল্যাণী। (মহিমের পা জড়াইয়া) এবারটার মত দাদাকে ক্ষমা করো বাবা। আর না হয় দাদাকে রেখে আমাকে বিদেয় করো। আমি তো এসংসারের কেউই নই।

সুরেশ। ক্ষমা আমাকে বাবা করবেন না কল্যাণী। আমি চললুম। গুড্ বাই!

(প্রস্থানোদ্যত; এমন সময় দেখা গেল বাইরে যাওয়ার দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বীরেশ ও অনাথ নীরবে কাঁদিতেছে। তাহাদের দেখিয়াই—)

সুরেশ। ও কে?…কারা?……বীরেশ? অনাথ? (দুই হাতে দু'টি ভাইকে বুকে জড়াইয়া) বড় আদরের, বড় স্নেহের দু'টি ভাই আমার! কত কষ্টে মানুষ করেছি। আজ ছেড়ে যেতে… না, না, আর বেশীক্ষণ থাকলে আমি কেঁদে ফেলবো। স্টুপিড চোখ দু'টো কাঁদবার জন্যে ছটফট করছে। বীরেশ, অনাথ—ওরে, চিরজীবনের মত তোদের হতভাগ্য বড়দা তোদের ছেড়ে চললোরে! গুড্‌বাই! (প্রস্থানোদ্যত)

(অকস্মাৎ একটি সুটকেশ হাতে তপতীর ঘরের সিঁড়ির উপর তপতী বাহির হইয়া দাঁড়াইল।)

তপতী। আমি?

সুরেশ। কে? ও! তুমি! জীবনসঙ্গিনী? হ্যাঁ, তুমিও!

(হাত বাড়াইল, তপতী হাত ধরিল এবং এক মুহূর্তের জন্য সকলের মুখগুলি আর একবার দেখিয়া লইয়া তপতীকে টানিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। পিছন-পিছন ব্যাকুলভাবে বীরেশ ও অনাথ গেল।)

কল্যাণী। বড়দা !..... বড়দা !......বৌদি ! (ডাকিতে-ডাকিতে দরজা পর্যান্ত গেল।)

ধীরেশ। দাদা ! দাদা ! !

(এদিকে প্রস্তর মূর্তির ন্যায় দণ্ডায়মান পিতা মহিম চৌধুরী ভিতরে এক আগ্নেয়গিরির ধাক্কা চাপিতে না পারিয়া অস্বাভাবিকভাবে কাঁপিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া ধীরেশ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—)

ধীরেশ। বাবা ! বাবা !...দিদি,...বাবা !

কল্যাণী। (ফিরিয়া আসিয়া মহিমকে ধরিয়া) বাবা ! বাবা ! !

(কাঁপিতে-কাঁপিতে মহিম পড়িয়া যাইতেছিলেন, দুই দিক দিয়া ধীরেশ ও কল্যাণী তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। ড্রপ নামিয়া আসিল।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

[রায় বাহাদুর শ্রীগণনাথ রায়ের বাড়ী। তপতী ও সুরেশ আসিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছে। বলা-বাহুল্য, রায় বাহাদুর তপতীর পিতা। বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর বাড়ীতে নাই, কী একটা জরুরী কাজে মফঃস্বলে গিয়াছেন। প্রভাত অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে। সুরেশ বাড়ীতে নাই। তপতী অর্গান বাজাইয়া প্রফুল্লভাবে গান . গাহিতেছে। গান শেষ হইবার পূর্বেই ডাক্তার পুলক সেন আসিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া তপতীর গান উপভোগ করিতেছিল। গান শেষ হইতেই—]

(তপতীর গান)

আজি ক্ষণে-ক্ষণে পড়ে মোর মনে
আমি তব কেহ নয়।
খেলা ছলে শুধু ধরার ধূলায়
হয়েছিল পরিচয়॥

ভালোবাসা দিয়ে বেসেছিলে ভালো,
আঁধার হৃদয়ে জ্বেলেছিলে আলো;
সেই স্মৃতি আজো পরাণ ভরিয়া—
হয়ে আছে মধুময়॥

দীপ-নেভা ঘরে আমি একা জাগি
আঁখি মেলি' বাতায়নে ,
কী জানি কখন নেমে আসে জল
ভরি' মোর দু' নয়নে।

গন্ধবিহীন ঝরা ফুল সম,
বেদনা আমার কাঁদে প্রিয়তম—
তোমার নয়নে হোক আজি মোর—
নয়নের বিনিময় ॥

পুলক। (গলার শব্দ করিয়া) আজ কেমন আছেন, মিসেস্ চৌধুরী ?

তপতী। কে! ডাক্তারবাবু ? আসুন—বসুন! কখন এলেন ?

পুলক। এলুম আপনার ঠিক যখন 'হয়েছিল পরিচয়'!

তপতী। মানে ?

পুলক। মানে আপনার গানের মাঝখানে যেখানে 'হয়েছিল পরিচয়' কথাটা আছে—ঠিক সেই সময় এ বাড়ীতে আমি আজ প্রবেশ করি।

তপতী। (হাসিয়া) তাই বলুন! কিন্তু যাই বলুন, আপনি ভারী দুষ্টু!

পুলক। দুষ্টু! কেন ?

তপতী। লুকিয়ে আমার গান শুনে নিলেন কেন ?

পুলক। কারণ লুকিয়ে গান শুনলে আসল গান শোনার সুযোগ পাওয়া যায় বলে'!

তপতী। আসল গান ?

পুলক। হ্যাঁ, যে ব্যথা বা আনন্দ প্রকাশের জন্যে গান গাওয়া হয়—তা বেশ পরিচ্ছন্নভাবে ধরা যায় মিসেস্ চৌধুরী!

তপতী। বটে! তা কোনটা পেলেন আমার গানে?

পুলক। পেলুম একটা বিরাট ব্যথার পরিচয়!

তপতী। বি-রা-ট?

[প্রাণেশ্বর আসিয়া এই সময় চা ও প্রাতঃকালীন জলযোগ ট্রেতে করিয়া রাখিয়া গেল।]

পুলক। মানে—মানে—

তপতী। বয়!

প্রাণেশ্বর। বয় নয় দিদিমণি! আমার নাম প্রাণেশ্বর!

তপতী। আর এককাপ চা!

প্রাণেশ্বর। আর এক কাপ? ডাক্তারবাবুর জন্যি বুঝি?

তপতী। হ্যাঁ, যাও!

প্রাণেশ্বর। যাই! (স্বগতঃ) ডাক্তারবাবুটো বেশ দেখতিছি। দিদিমণির রোগ সারাতে পারবেন বটে!

তপতী। দাঁড়িয়ে আছো যে? যাও!

প্রাণেশ্বর। হ্যাঁ যাই দিদিমণি! [প্রস্থান]

পুলক। বয়টি আপনাদের বেশ রসিক লোক দেখছি! আপনার মুখে ওর নামটি ও শুনতে চায়!

[পুলক ও তপতী একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল]

পুলক। যাক! এখন তাহ'লে বেশ সুস্থ আছেন, বলুন? মাথা আর ধরেনা তো?

তপতী। না। এখন বেশ ভালোই আছি।

পুলক। দিন আষ্টেক আগে যখন আপনার বাবার মোটারখানা আমার ডিস্‌পেন্‌সারির সামনে গিয়ে থামলো এবং রোগের বিবরণটি

যেরকম শুনলুম, তাতে আমি বেশ ভয়ই পেয়েছিলুম, মিসেস্ চৌধুরী !

তপতী। কেন ?

পুলক। মানে সিম্‌টম্‌স্‌গুলো অনেকটা থাইসিসের মত ছিল কীনা !

তপতী। যদি তাই হতো, তাতে আপনার কী ডাক্তারবাবু ?

পুলক। হ্যাটস্-এ কোশ্চেন্ ! দেখুন, আমার অবশ্য কিছু নয়, তবে এরকম একটা ফুল অকালে ঝরে যাবে—সেইজন্যেই আমার দুঃখ !

তপতী। (হাসিয়া) ডাক্তারদের প্রাণেও কাব্য জাগে, দেখছি !

পুলক। আমাকে ভুল বুঝবেননা মিসেস্ চৌধুরী। আমি কোন সেন্স্ নিয়ে কথা বলিনি !

তপতী। দিন দশেক হলো বাপের বাড়ীতে এসেছি,—দিন আষ্টেক হ'লো আপনি আমার চিকিৎসা করছেন—তার মধ্যে এতো ? চিকিৎসার মেয়াদ যদি বেড়ে যায় তাহলে তো দেখছি······আচ্ছা বসুন, দেখি আপনার চা আনতে এতো দেরী হচ্ছে কেন ! বয় ! বয় ! [প্রস্থান]

পুলক। (স্বগতঃ) আই হ্যাভ্ এ্যাটেম্পটেড্ হার টু আরলি ! এখনও ধৈর্য ধরতে হবে। তবে যে রোগের ভয় দেখিয়েছি, তাতেই আমি অনায়াসে এ বাড়ীতে বেশ যাওয়া-আসা করতে পারবো। এখন চা আনবার আগেই সরে' পড়ি।

[টুপিটি বগলে চাপিয়া পুলক চুপি-চুপি প্রস্থান করিল। অন্য দরজা দিয়া সুরেশ প্রবেশ করিয়া পুলকের পরিত্যক্ত আসনেই বসিয়া পড়িল।]

[এক কাপ চা হাতে তপতীর প্রবেশ]

তপতী। মনের সকল গ্লানি, দেহের সকল অবসাদ দূর করবে এই এক কাপ চা। নিন ডাক্তারবাবু!

সুরেশ। (চা লইয়া) নট্ দি ফরচুনেট্ ডক্টর, বাট্ দি এভার ইডিয়েট হাস্‌বেণ্ড্।

তপতী। (আঁৎকাইয়া) তুমি!

সুরেশ। প্যারাডাইস্ লষ্ট্! দেবের জায়গায় দানব—না? (চায়ের কাপে চুমুক দিয়া) যাক্, হ্যাং ইওর ডক্টর! শোন, এরকম করে' আর কতদিন চলবে?

তপতী। যতদিন চলে!

সুরেশ। যতদিন চলে কথাটা তোমার পক্ষে বলা যত সহজ, আমার পক্ষে ঠিক ততটা নয়, জেনো!

তপতী। কথাটা আমিও অস্বীকার করছিনে!

সুরেশ। তবে?

তপতী। তবে আবার কী? তোমার পক্ষে যদি এখানে থাকা নিতান্তই অসম্ভব হয়, তুমি যেখানে ইচ্ছে থাকতে পারো। কিন্তু আমি এখান থেকে যাবোনা!

সুরেশ। শ্বশুরবাড়ীতে পড়ে থাকাটা কোন পুরুষের পক্ষেই গৌরব নয়, জেনো!

তপতী। অগৌরবের কাজ করবার জন্যে আমি তো কাউকে মাথার দিব্যি দিচ্ছিনে!

সুরেশ। আমি চাই, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। বেড়াতে এসেছি বলে' এর বেশী এখানে থাকলে একদিন সব বেফাঁস হয়ে যাবে, তা জানো?

তপতী। গেলেই বা! আমার বাবা-মা তো আমাকে রাস্তায় নামিয়ে দেবেন না!

সুরেশ। কিন্তু বিয়ে হবার পর মেয়ে যদি বাপের বাড়ীতে থাকে, জেনো, সেটা বাপের বাড়ীর অধিকারে নয়, বাপ-মায়ের দয়ায়।

তপতী। হতে পারে। কিন্তু বাপ-মায়েরও একটা এক্‌সেপ্‌শান্ আছে। আমার বাবাকে তুমি চেনোনা, তাই এমন কথা বলছো। বাবা ফিরলে, আমি নিজে সমস্ত কথা বলবো, দেখবে, তিনি খুসীই হবেন।

সুরেশ। জানিনা। কিন্তু আমার এখানে থাকতে রীতিমত কাঁটা বিঁধছে। যাই হোক, ঠাকুরকে বলো, আমি এখুনিই বেরুবো।

তপতী। কোথায় বেরুবে?

সুরেশ। বড়বাজারে একটা দিশী কোম্পানীতে চান্স্ পাবার আশা আছে, একবার সেখানে যাবো!

তপতী। চান্স্! চান্স্ তুমি রোজই পাচ্ছো! আজ দশদিন ধরে' রোজই তো চাকরীর জন্যে ঘুরছো, রোজই চান্স্ পাচ্ছো!

[প্রস্থান]

সুরেশ। (স্বগতঃ) জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। শেষকালে শ্বশুরবাড়ীর অন্ন পর পর দশদিন খেতে হলো? আজ যে কোন প্রকার চাকরী একটা জোগাড় করতেই হবে। ডিগ্রির মোহ ছেড়ে যে কোন জব্ আমি নেবোই।

[প্রাণেশ্বরের প্রবেশ ; হাতে তাহার তেলের বাটী]

প্রাণেশ্বর। জামাইবাবু, তেল আনিছি।

সুরেশ। ওখানে রাখো।

প্রাণেশ্বর। মা বললেন, জামাইবাবুকে তেল মাখাতি। আপনাকে তেল মাখাবো জামাইবাবু?

সুরেশ। জামাইবাবুদের তেল মাখাতে হয়—কথাটা সত্যি। কিন্তু আমি যে অন্য জাতের জামাইবাবু!

প্রাণেশ্বর। তা ওরকম হয়েই থাকেন, জামাইবাবু! বড়লোকের বাড়ীতি আজকাল স্বজাতে-স্বজাতে বে'থা খুব কমই হয়। ভেবে দেখুননা, আমি যেখানে আগে ছেলুম, সেখানে ইঞ্জিনের মেয়ে হলো বামুন আর যার সঙ্গে তার বে' হ'লো সে হ'লো শুদ্দুর! বে'র আগে তাদের ভালোবাসা-প্রেন্নয়-টেন্নয় নাকী সব ছে'লো কীনা। তা' এরা তো শুনিছি কায়স্থ। আপনি বুঝি বামুন? আপনাদেরও বুঝি বে'র আগে—

সুরেশ। না হে, বিয়ের আগে আমাদের কিছু হয়নি আর আমি বামুনও নই।

প্রাণেশ্বর। তবে কী চাঁড়াল-টাড়াল বুঝি?

সুরেশ। (হাসিয়া) বড় রসিক লোক তো দেখছি! শোন, তোমার দিদিমণিও যে জাতের, আমিও সেই জাতের।

প্রাণেশ্বর। তবে আমার সঙ্গে মস্করা করতেছেলেন বুঝি?

সুরেশ। তোমার নামটা কী যেন? কেবল ভুলে যাই—কী যেন হৃদয়বল্লভ নাকি—

প্রাণেশ্বর। আমার নাম প্রাণেশ্বর।

সুরেশ। নামটিও বড় রসের দেখি।

প্রাণেশ্বর। হেঁ-হেঁ! আপনাদের মা-বাপের আশীর্বাদে। তা জামাটা খুলে ফেলুন জামাইবাবু, তেল মাখাতি সুরু করি!

সুরেশ। (জামা খুলিয়া) তেল তোমাকে মাখাতে হবেনা, তুমি ওখানে বস। আমি নিজেই মাখছি।

প্রাণেশ্বর। উঁহুঁ, সে হয়না জামাইবাবু! মা যদি শোনেন, আমার চাকরী যাবেন। দিন আমি মাখাই। (প্রাণেশ্বর তেল মাখাইতে থাকিল)

সুরেশ। (এদিক-ওদিক চাহিয়া) হ্যাঁ হে হৃদয়বল্লভ—

প্রাণেশ্বর। হিদয়বল্লভ নয় জামাইবাবু, আমি প্রাণেশ্বর!

সুরেশ। ওই হ'লো! হ্যাঁ হে প্রাণেশ্বর, কাছাকাছি কোন ধেনো মদের দোকান আছে কী বলতে পারো?

প্রাণেশ্বর। ধেনো মদ! (আনন্দে) জামাইবাবুর ওসব চলেন নাকি?

সুরেশ। বিলক্ষণ চলে! আজ আট-দশদিন পেটে পড়েনি। বত্রিশটি নাড়ী যেন পাক খাচ্ছে।

প্রাণেশ্বর। খাবারই কথা। ও কী জিনিষ!

সুরেশ। তা তোমারও চলে বুঝি?

প্রাণেশ্বর। ঈসারায়!

সুরেশ। বেশ! বেশ! তাহ'লে শুভ কাজে আর বিলম্ব কেন, ট্যাঁকে এই পাঁচসিকে পয়সা আছে, খানিকটা ধেনোর ব্যবস্থা করে' ফেলো। (পয়সা ট্যাঁক হইতে বাহির করিয়া দিতে গেল—)

প্রাণেশ্বর। (বাধা দিয়া) থাক, থাক! বড় লোকের বাড়ীর বয় আমি, একেবারে নিরমিষ্যি হ'লে ভগবান যে আমাকে নরকে পাঠাবেন, জামাইবাবু! পয়সা আপনি রেখে দেন, সব ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি।

সুরেশ। কী রকম?

প্রাণেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ, পয়সাও লাগবেনা, অথচ খাসা বিলিতি এনে দিচ্ছি।

সুরেশ। বলো কী! তোমাকে যে আমার কোলে করে নাচাতে ইচ্ছে করছে, প্রাণেশ্বর! আরে রাখো তোমার তেল মাখানো, আগে এই অনাহারীকে বাঁচাও!

প্রাণেশ্বর। (সহাস্যে) আচ্ছা, আচ্ছা! [প্রস্থানোদ্যত]

সুরেশ। আর একটা কথা শোন প্রাণেশ্বর—

প্রাণেশ্বর। বলে ফেলেন—

সুরেশ। (এদিক-ওদিক চাহিয়া) আমার এই গোপন ব্যাপারটা যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে।

প্রাণেশ্বর। পেরাইভেট্ তো?

সুরেশ। তুমি আবার ইংরিজীও জানো দেখছি!

প্রাণেশ্বর। হেঁ হেঁ! তা আর জানবোনা বাবু? আড়াই কুড়ির কাছাকাছি বয়স হ'লো, কাজ করলুম এক ডজনেরও ওপর সভ্য বাড়ীতি, আর ইংরিজী একটু-আধটু জানবোনা?

সুরেশ। কিন্তু—

প্রাণেশ্বর। আপনার ওই টুকু-টুকুর পেরাইভেট্ তো? ও আর কী পেরাইভেট্ বাবু! ওর চেয়ে কত বড়-বড় নাক-হু'নাক পেরাইভেট্ কেচ্ছাকাণ্ড এই প্রাণেশ্বর মণ্ডলের পেটের ভেতর বজ্‌বজ্ করতেছে, কিন্তু বেইরে কোনদিন পড়েনি। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন—নিশ্চিন্তে থাকুন— [প্রস্থান]

সুরেশ। বাপ্‌স্! দশদিন পেটে এক পলাও যায়নি—কী যে হচ্ছিল! আজ বাঁচবো! দশদিন ভাত না খেয়েও থাকতে পারি, কিন্তু এ জিনিষটা একবেলা না হ'লে—

[দরজায় অকস্মাৎ ডাক্তারের পুনরাবির্ভাব ও সুরেশকে দেখিয়া পলায়নের চেষ্টা।]

সুরেশ। আরে কে ও! ডাক্তার? পালাচ্ছো কেন? এসো! এসো!

পুলক। (ঢুকিয়া) মানে—মানে আমি আমার স্টেথিসকোপটা ফেলে গিয়েছিলুম কিনা—

সুরেশ। (ডাক্তারের পকেট দেখাইয়া) মাই ডিয়ার! লেম এক্স্কিউজ্! স্টেথিসকোপ তো তোমার পকেটে—

পুলক। তাহলে বোধহয় হ্যাটটা—

সুরেশ। বাট্ হ্যাটস্ অন ইওর হেড্—

পুলক। তাহ'লে—তাহ'লে—

সুরেশ। তাহ'লে বোধহয় প্রাণটা? ইজ্ ইট্ নট্ ট্রু? রোগিনীকে ডেকে দেবো? আই মিন্ তপতীকে—?

পুলক। না—না,—মানে—মানে—

সুরেশ। পরের বৌকে ইলোপ করবার চেষ্টা এই বোধহয় তোমার প্রথম ডাক্তার? পারবে, পারবে! চেহারাখানা বড় জব্বর আছে—নাইন্টি মার্ক ওইখানেই। আর টেন্ হ'লো বচন। বচনটাকে আগে ঠিক করো। এবং মহাজনদের ওই 'ট্রাই-ট্রাই-ট্রাই এগেন্' কথাটা বুকের মাদুলি করে রাখো!

পুলক। আপনি আমাকে ইন্সাল্ট করছেন, সুরেশবাবু!

সুরেশ। ওই ছাখো! এখনো অনেক কাঁচা দেখছি। শোন: মান, অপমান, ভয়, লজ্জা, ঘৃণা, তিরস্কার—এই ছ'টি কথা প্রেমিকদের ডিক্স্নারীতে রেখোনা।—বুঝেছো?

[দরজায় প্রাণেশ্বরের আবির্ভাব]

পুলক। আজ্ঞে—

সুরেশ। ওসব মেয়েলিপনায় কিছু হবেনা। যাও, এখন যাও ডাক্তার! অন্য সময় এসে চান্স্ নিও। এখন আমি বাড়ীতেই আছি। যাও!

পুলক। নমস্কার!

সুরেশ। ধ্যেৎ!

[ডাক্তারের প্রস্থান]

[একটা কাঁচের গেলাসে হাত চাপা দিয়া প্রাণেশ্বরের প্রবেশ]

প্রাণেশ্বর। নিন্ জামাইবাবু!

সুরেশ। (গেলাস লইয়া) বা-বা-বা! খাসা চিজ্! কিন্তু কোয়ান্টিটিটা যে বড় কম প্রাণেশ্বর। আমার সাগরতুল্য পিপাসার কাছে এ যে একটি ছোট্ট চৌবাচ্চা—

প্রাণেশ্বর। যা আনিচি, তাড়াতাড়ি শেষ করে' ফেলেন জামাইবাবু, এখুনি কেউ এসে পড়বেন।

সুরেশ। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য! (মদ পান করিয়া) বা-বা-বা! (পুনরায় শূন্য গেলাস গালে ঢালিয়া) কী জিনিষ তুমি খাওয়ালে প্রাণেশ্বর। আহা-হা, কোথায় পেলে বাপ্?

প্রাণেশ্বর। রায়বাহাদুরের বোতল থেকে।

সুরেশ। তাই নাকি? শ্বশুরমশায়ও আমার দলে? তাহ'লে তো অলক্রিয়ার।

প্রাণেশ্বর। আহা বাবু, চেঁচামেচি করবেন না।

সুরেশ। কিন্তু আর একটু যে নিয়ে আসতে হয় প্রাণেশ্বর!

প্রাণেশ্বর। না বাবু, ধরে ফেলবে!

সুরেশ। আরে ফেল্লেই বা! শ্বশুরমশায় আর আমি তো স্বগোত্রেরই!

প্রাণেশ্বর। তা হোক, আছেন যখন, ধীরি-ধীরি হবে 'খন। দিন গেলাসটা রেখে আসি। কেউ এসে পড়বে।

সুরেশ। (গেলাস দিয়া) এ যে কেবল কল্‌জে কালিই করে' গেল প্রাণেশ্বর, কল্‌জের ওপারে তো গেলনা। (নিঃশ্বাস মোচন)

প্রাণেশ্বর। (এদিক-ওদিক চাহিয়া) হবে বাবু, আবার হবে। এরা হ'লো ভদ্দর লোক! এদের রোগ হ'লো বেলাড্ পেসার, খেলা হ'লো ঘোড়দৌড়, আর নেশা হ'লো মদ। সেইরকম খাঁটি ভদ্দর লোকের বাড়ীর জামাই হয়ে আপনি একপলা বিলিতির জন্যে নিঃশ্বেস ফেলছেন বাবু? আছেন তো এখন দিনকতক, আপনাকে (গেলাস দেখাইয়া) এই দিয়ে পিত্যহ চান করিয়ে দেবো। হে-হে! (প্রস্থান)

সুরেশ। হা-হা-হা! (চেয়ারে বসিল) রায়বাহাদুরও তাহ'লে সেবন করেন। কিন্তু তিনি ঘরে আর আমি বাইরে,—তিনি রায়বাহাদুরী বজায় রেখে আর আমি লোফারী করে',—তিনি বিলিতী আর আমি ধেনো। হা-হা-হা!

[বাহিরে খদ্দরধারী বিভাস দাশগুপ্তের আবির্ভাব]

সুরেশ। কে ও? একেবারে স্বাধীনতার অগ্রদূত বলে' মনে হচ্ছে যে। ভারত কী স্বাধীন হয়ে গেছে নাকি?

বিভাস। আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছে—কিছুটা। তপতী দেবী বাড়ী আছেন?

সুরেশ। ওবাব্বা! তুমিও একজন ক্যাণ্ডিডেট্ নাকি?

বিভাস। আজ্ঞে?

সুরেশ। বলছি তপতীর আগমনের খবরটা কী তোমরা সব খবরের কাগজে পেয়েছো?

বিভাস। আজ্ঞে না, তপতী আমার ক্লাশফ্রেণ্ড কীনা—

সুরেশ। ওরে বাপস্! তোমার দাবী যে দেখছি ডাক্তারকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

বিভাস। দেখুন, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা।

সুরেশ। না বোঝবারই কথা। কারণ বুঝলে অনেক ঝামেলা।

বিভাস। আজ্ঞে?

সুরেশ। নাঃ! জিজ্ঞেস করছি—তুমি কে? নাম কী?

বিভাস। (বিরক্তভাবে) আমি শ্রমিকনেতা—নাম আমার বিভাস দাশগুপ্ত।

সুরেশ। ও! তা শ্রমিকনেতার হঠাৎ তপতী দেবীকে দরকার পড়লো কেন?

বিভাস। ডোনেশান্ নিতে এসেছি।

সুরেশ। ডোনেশান্! কিসের ডোনেশান্?

বিভাস। 'নিখিল বঙ্গ শ্রমিক সঙ্ঘে'র জন্যে—

সুরেশ। ওরে ফাদার! এর মধ্যে আবার একটা 'নিখিল বঙ্গ'ও আছে? তবে চাঁদা না দেয় কোন্ ইয়ে! হাঁ, দলে কে কে আছেন?

বিভাস। কে-কে মানে?

সুরেশ। মানে এই নামজাদা কেউ—

বিভাস। আজ্ঞে না, গোটা বারো আমার মত উৎসাহী যুবক আর গোটা চারেক মেয়েকে নিয়েই আমাদের এই 'নিখিল বঙ্গ—'

সুরেশ। মেয়ে! তাহ'লে তো চূড়ান্ত—

বিভাস। তপতী দেবীকে খুঁজতে আমি কী ভেতরে যাবো?

সুরেশ। অনায়াসে। কিন্তু আর কয়েকটি কথার উত্তর দাও ব্রাদার! আচ্ছা, এই মেয়ে ছাড়া কী তোমাদের কোন দলই হয়না?

বিভাস। সে আপনি বুঝবেন না। নারী ও পুরুষের মিলিত উৎসাহে কাজ যেমন করা যায়, শুধু-শুধু তেমন হয়না!

সুরেশ। বটে! তা তোমাদের এই 'নিখিল বঙ্গ'টি কতদিনের ব্যাপার?

বিভাস। তপতী দেবীর বিয়ে হবার পরের দিন থেকেই এ সঙ্ঘের জন্ম। তপতী দেবীর বিয়ে না হ'লে তিনি আমাদেরই হতেন।

সুরেশ। তাই নাকি? যিনি তাহ'লে তপতী দেবীকে বিয়ে করেছেন, তিনি তোমাদের ক্ষতি করেছেন, বলো?

বিভাস। নিশ্চয়ই! তিনি শুধু আমাদেরই শত্রু নন, দেশের শত্রু! আমি ভেতরে যাচ্ছি! [প্রস্থানোদ্যত]

সুরেশ। কিন্তু আমার পরিচয়টা তো জিজ্ঞেস করলেনা শ্রমিকনেতা?

বিভাস। আপনাকে তপতী দেবীর স্বামী বলেই আমার সন্দেহ হচ্ছে!

সুরেশ। অর্থাৎ 'নিখিল বঙ্গ শ্রমিক সঙ্ঘে'র শত্রু,……দেশের শত্রু— কী বলো? হা হা-হা!

[বিভাস অকারণে টুপিটি একবার মাথায় চাপিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রস্থান করিল।]

[প্রাণেশ্বরের প্রবেশ]

প্রাণেশ্বর। হাড়হাবাতে, বাউণ্ডুলে কোথাকার!

সুরেশ। কী হ'লো হে প্রাণেশ্বর? কাকে অমন সুমধুর ভাষায় অভিনন্দন জানাচ্ছো?

প্রাণেশ্বর। আজ্ঞে ওই দেখুন না! ধর্মের ষাঁড়টা সিঁড়ির মুখে মারলেনা আমায় একটা ধাক্কা!

সুরেশ। ও! তা ধাক্কা দিয়ে কোথায় গেলেন ধর্মের ষাঁড়টি?

প্রাণেশ্বর। কোথায় আবার ? হন-হন করে' একেবারে ওপরে দিদিমণির ঘরে !……রাগ করবেননা জামাইবাবু, আপনাদের ভদ্দর-লোকের বাড়ীতি এই একটা দেখলুম—লাজ-লজ্জার বাচ-বিচার বলে এখানে কিছু নেই। বাইরে থেকে যে-ই আসতেছে সে-ই শোবার ঘর থেকে সুরু করে একেবারে রান্নাঘর পর্যন্ত চষে ফেললে জামাইবাবু, একেবারে চষে ফেললে !

সুরেশ। এ্যারিস্ট্রোক্যাসি প্রাণেশ্বর, ওর নাম এ্যারিস্ট্রোক্যাসি।

প্রাণেশ্বর। কী বল্‌লেন ?

সুরেশ। এ্যারিস্ট্রোক্যাসি।

প্রাণেশ্বর। আজ্ঞে হ্যা, তা হবে। ওরকম একটা বদখত বিলিতি নামই হবে। কেননা বাংলা দেশের দিশি কায়দা তো ওরকম নয়।·· কিন্তু ওই যা!

সুরেশ। আবার কী হ'লো হে প্রাণেশ্বর ?

প্রাণেশ্বর। ইতরপানা ভদ্দর লোকটারে গাল দিতি-দিতি আপনারে আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি।

সুরেশ। তা এইবারে বলে' ফেল তোমার সেই আসল কথাটি।

প্রাণেশ্বর। মা আপনারে চান করে নিতি বললেন।

সুরেশ। এই তোমার আসল কথা ? সত্যিকারের আসল কথা হ'লে না জানি কী করতে। চলো, চলো!

প্রাণেশ্বর। চলুন!

[উভয়ের প্রস্থান]

[অন্য দরজা দিয়া তপতী ও বিভাসের প্রবেশ]

তপতী। কাজ কতটা এগিয়েছে বিভাসবাবু ? (বসিল)

বিভাস। (বসিয়া) অনেকটা এগিয়েছে। দেশের মধ্যে আমাদের সঙ্ঘের নাম যথেষ্ট প্রচার না হ'লেও, কাজ আমাদের বেশ হচ্ছে।

তপতী। সাহায্য-টাহায্য কেমন পাচ্ছেন?

বিভাস। এমনি চাইলে বিশেষ কিছু পাওয়া যায়না, তবে অন্যভাবে আদায় করতে হচ্ছে।

তপতী। অন্যভাবে!

বিভাস। মানে কোন অসৎভাবে নয় অবশ্য। আজকাল দেখেছেন তো 'সাহায্য রজনী'র হিড়িক? মাঝে-মাঝে সেই 'সাহায্য রজনী' মারফৎ আমাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। তা এমনি চাওয়ার থেকে এ টাকা বেশ ওঠে।

তপতী। ও! কিন্তু তবুও কাগজে প্রায় শ্রমিকদের দুর্দশার কথা শুনি কেন?

বিভাস। সকল শ্রমিকের ভার তো আমরা নিতে পারিনা তপতী দেবী। (নিম্নকণ্ঠে) আর তা ছাড়া আমাদের নিজেদের পারসোন্যাল্ এক্স্পেন্স আছে, ঘর-সংসার আছে। দেখুন না, মেয়ে ক'টার খরচই তো হাতী পোষার চাইতেও বেশী। আহা, বোঝেনই তো সব—

তপতী। বুঝি। সঙ্ঘের মেম্বার সংখ্যা কত?

বিভাস। বিশেষ নয়—সবশুদ্ধ জন পনেরো-ষোলো। অবশ্য যদি আপনাদের মত দু' একটি মেয়ের নাম আমাদের সভ্যাদের তালিকায় থাকতো, তাহ'লে এতদিনে আমরা অনেক কিছু করতে পারতুম। এ্যাক্সিডেন্টলি আপনার বিয়েটা হয়ে গেল!—

তপতী। খুব সত্যি কথা বিভাসবাবু! আমি সঙ্ঘের মধ্যে থাকলে এমন কাণ্ড হতে দিতুমনা। যাক, ডোনেশান্ আপনাকে কত দিতে হবে?

বিভাস। সঙ্ঘের একজন ভূতপূর্বা সভ্যার মুখে আমরা একথা শুনবো আশা করিনি তপতী দেবী!

তপতী। বটে! আচ্ছা বসুন। (চেক বই আনিয়া) এই নিন তিনশো টাকা। বাবার চেক বই—সই করাই আছে, শুধু সংখ্যাটা আমি বসিয়ে দিলুম।

[চেকে তপতী তিন শত টাকা লিখিয়া বিভাসের হাতে দিল।]

বিভাস। (লইয়া) ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ!

তপতী। ধন্যবাদটা আশাকরি 'নিখিল বঙ্গ শ্রামক সঙ্ঘের' পক্ষ থেকেই পেলুম—

[চেকখানা ভাঁজ করিয়া বিভাস পকেটে রাখিতে যাইতেছিল, তপতীর কথায় অকস্মাৎ থামিয়া গেল—]

তপতী। মানে আমি সাহায্যটা করলুম 'নিখিল বঙ্গ শ্রমিক সঙ্ঘে'র দিকে চেয়েই বিভাসবাবু। হাতী পোষা, কারুর পারসোন্যাল্ একস্‌পেন্স্ বা সংসার চালাবার জন্যে ও টাকা আমি দিইনি।

বিভাস। (উচ্চহাস্য করিয়া) ও হো! তাই বলুন।

[মাথা মুছিতে-মুছিতে সুরেশের প্রবেশ]

সুরেশ। বড় পুলক যে শ্রমিকনেতা! মোটামুটি বাগিয়েছো বুঝি? কত?

বিভাস। (বিরক্তভাবে) তিনশো

সুরেশ। তিন শো! চিয়ার-ও! কলেজ জীবনের দাবী নিয়ে তো তাহ'লে মোটা বাগালে—এঁ্যা ?

তপতী। ঠাকুর তোমার জন্যে ভাত বেড়ে বসে আছে। যাও!

সুরেশ। যাচ্ছি! (পকেট হইতে চিরুণী বাহির করিয়া মাথা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে) তাহ'লে শ্রমিকনেতা, তুমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে অবাধে আলাপ করো, আমি ভাত খাওয়ার চেষ্টা করিগে। [প্রস্থান]

বিভাস। আপনার স্বামী একটা ইয়ে! মানে লোকটা খুব সুবিধে নয়।

তপতী। (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) জানি বিভাসবাবু।

বিভাস। আপনার তাহ'লে খুবই অশান্তি তপতী দেবী ?

তপতী। একটু হয়েছে বৈকি!

বিভাস। (তপতীর পাশে আসিয়া) একটু নয় তপতী দেবী, আপনার মুখের দিকে চাইলে আমার বাঁচতে ইচ্ছে করেনা।

তপতী। মারা যাবেন নাকি ?

বিভাস। আপনি উপহাস করছেন তপতী দেবী, কিন্তু আমার ভেতরটা যা করছে। উঃ!

তপতী। সেরেছে! আপনি এখুনি মারা যাবেন নাকি ?

বিভাস। না, কবিতা লিখবো। মনের খেদ মিটিয়ে একটা কবিতা লিখবো।

তপতী। আপনি এখনো কাব্যচর্চা করেন ? কলেজে একবার শুধু এই কবিতা লেখবার জন্যে আপনাকে বের করে' দিয়েছিল মনে হচ্ছে :

বিভাস। তা আমারও মনে আছে তপতী দেবী। কিন্তু আপনার

অবস্থা দেখে আমার কবিতা লেখা ছাড়া যে আর কোন উপায়ই নেই! (বুক চাপিয়া) আগুন! স্রেফ আগুন!

[সুরেশের প্রবেশ]

সুরেশ। দেশ-সেবা হচ্ছে বুঝি শ্রমিকনেতা?

বিভাস। (তাড়াতাড়ি সরিয়া) আজ্ঞে না—

সুরেশ। চমৎকার! চমৎকার দেশ সেবার নমুনা! বড় বেরসিকের মত অসময়ে এসে পড়েছি—না?

তপতী। তুমি ভাত খাওনি?

সুরেশ। তোমার দুর্ভাগ্য তপতী যে, ঠাকুর এখনো ভাত রান্না শেষ করে উঠতে পারেনি। হ্যালো শ্রমিকনেতা, স্বাধীনতার অগ্রদূত, ভারতের প্রাণ—এইবার যে সরে' পড়তে হয়! আই মিন্, আমি এখানে এখন বসবো!

বিভাস। (উঠিয়া তপতীকে) নমস্কার! পরে আর একদিন দেখা হবে।

সুরেশ। (বসিয়া) বড় ব্যথা পেলে নাহে প্রেমিকনেতা—আই :মিন্ শ্রমিকনেতা?

[বিরক্তভরে বিভাসের প্রস্থান]

সুরেশ। এরাই বুঝি দেশের স্বাধীনতা এনেছে? হুঁঃ! বাইরে খদ্দরের মুখোস আর বাঁধা কতকগুলি বুলির ভড়ং রেখে এরা বেশ ভারতের মুক্তিকামীর অভিনয় করে' যাচ্ছে বটে!

তপতী। বিভাসবাবুকে তুমি চেনোনা, তাই এমন কথা বলছো!

সুরেশ। হুঁ! এ্যাট্ ফার্ষ্ট সাইটে চেনবার মত মানুষ নয় বটে ওই বেড়াল তপিস্থিটা, তাহ'লেও—

তপতী। না, তাহ'লেও নয়। সে সত্যিই দেশের কাজ করে। রাত্রি-দিন বস্তীতে-বস্তীতে ঘুরে সে প্রকৃত অভাবগ্রস্থ লোকদের সাহায্য করে' বেড়ায়—

সুরেশ। ঈশ্বর তাকে আরো বিভাসিত করুন তাহ'লে!

তপতী। (বিরক্তভাবে) হুঁঃ!

সুরেশ। আহা-হা! অন্যভাবে নিচ্ছ কেন? একটু আগে আমি তাকে কোন অভাবগ্রস্থ লোককে সাহায্য পর্যন্ত করতে দেখেছি যে!

তপতী। কোথায়?

সুরেশ। বেশী দূরে নয়, এই ঘরে।

তপতী। এই ঘরে!

সুরেশ। হ্যা! তোমার প্রাণ থেকে বেরিয়ে আসা দীর্ঘনিঃশ্বাসকে শুধু নিঃশ্বাসে প্রমোশান দেবার জন্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল!

তপতী। (উঠিয়া) তোমার মন ভয়ানক সংকীর্ণ!

[প্রাণেশ্বরের প্রবেশ]

প্রাণেশ্বর। দিদিমণি! বাবু এয়েচেন!

তপতী। বাবু! বাবা? আমার বাবা? [প্রস্থানোদ্যত]

[গণনাথের প্রবেশ]

গণনাথ। যেতে হবেনা মা! এই যে বাবাজী! (তপতী ও সুরেশ প্রণাম করিল) থাক্! থাক্! (প্রাণেশ্বর লাঠি ও উড়ানি লইয়া প্রস্থান করিল) ওরে, খবরের কাগজটা নিয়ে আসিস। তারপর আমার মা-মণি, ছেলেকে মনে পড়লো মা?

তপতী। কী যে বলো বাবা! কবে এসেছি, তোমায়ই তো দেখা পাইনে!

গণনাথ। একটা জরুরী কাজে মফঃস্বলে গিয়েছিলুম, মা। সুরেশ, বেশ ভালো আছো তো বাবা?

সুরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গণনাথ। চাকরী-বাকরী করছো তো?

সুরেশ। আজ্ঞে না।

গণনাথ। কেন, একটা না করছিলে শুনেছিলুম—?

সুরেশ। করছিলুম বটে, কিন্তু সে কাজ করতে আমার প্রেসটিজে বাধলো, তাই ছেড়ে দিয়েছি।

গণনাথ। (সহাস্যে) প্রেসটিজ আর পয়সা দু'টি শত্তুর বাবাজী! পয়সাকে আনতে গেলে প্রেসটিজকে দূর করে দিতে হয়!

সুরেশ। কিন্তু আমার কাছে প্রেসটিজটাই বড়ো।

গণনাথ। তাহ'লে চিরকালই হা-পয়সা, হা-পয়সা করতে হবে বাবা। এই আমার কথাই ত্থাখোনা! প্রেসটিজকে বিসর্জন দিতে পেরেছি বলেই আজ তোমার মা-বাপের আশীর্বাদে দু'টো পয়সার আবাহন করতে পেরেছি। যাক, তোমার বাবার শরীর কেমন? ইদানীং তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ শুনেছিলুম।

সুরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ! তবে এখন একটু ভালোই আছেন।

[প্রাণেশ্বর সংবাদ-পত্র আনিল এবং গড়গড়ার নল হাতে ধরাইয়া দিল। তপতী চলিয়া গেল। প্রাণেশ্বর গণনাথকে বাতাস করিতে থাকিল।]

গণনাথ। ভাই-বোন সব ভালো?

সুরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গণনাথ। তোমার বোনটিকে আমার বেশ লাগে সুরেশ। মা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! কেন যে ভগবান ওকে বিধবা করলেন!

সুরেশ। সবই আমাদের ভাগ্য!

গণনাথ। তা তো নিশ্চয়ই বাবা! যাক, এসেছো যখন দিন কতক থাকো। আসা তো বড় একটা হয়না!

সুরেশ। আজ্ঞে —

গণনাথ। বেয়াই মশায় রাগ করবেন—এই তো? সে আমি লোক পাঠিয়ে আজই ঠিক করে' দিচ্ছি!

সুরেশ। আজ্ঞে সে কথা নয়! মানে দশদিন হয়ে গেল, এবার—

গণনাথ। দশদিনের মধ্যে একটি দিনের জন্যেও আমার তপা মাকে আমি কাছে পাইনি সুরেশ। দশদিন তোমার শাশুড়ী সে আনন্দ ভোগ করেছেন, অন্ততঃ দশটা দিন আমাকেও ভোগ করতে দাও বাবাজী!

সুরেশ। কথাটা ঠিক! কিন্তু বেড়াতে যাচ্ছি বলে—

গণনাথ। সন্তান কী জিনিষ তা তুমি জানবার সুযোগ এখনো পাওনি সুরেশ, তাই এমন কথা বলছো। আমার ছেলে বলো, মেয়ে বলো—সবই ওই তপা। তাকে কী একদিনের জন্যেও কাছে পাবার আশা করতে পারিনা বাবাজী?

সুরেশ। (স্বগতঃ) সন্তান কী জিনিষ!

গণনাথ। তুমিও যেমন তোমার বাবার বড় আদরের, বড় যত্নের, তপাও আমার তেমনি বাবা! তোমার বাবাও যেমন তোমাকে একদণ্ড না দেখলে দিশেহারা হন, আমারও ঠিক তেমনটি হয় বাবা।

সুরেশ। (স্বগতঃ) আমার বাবা! আমার বাবা!

গণনাথ। কী ভাবছো বাবাজী ?

সুরেশ। কিছু না !

গণনাথ। তা ছাড়া তপা'র কথাটাও একবার ভাবোতো ! জীবনের আঠারোটি বছর কাটিয়েছে এই বাড়ীতে। তোমার মত তার ভাই-বোনের টান না থাকলেও, টান তো একটা আছেই। কতদিন বাদে এসেছে।

সুরেশ। (স্বগতঃ) ভাই-বোনের টান ! ভাই-বোনের টান !! বুক ফেটে যাচ্ছেরে কল্যাণী, বুক আমার ভেঙ্গে যাচ্ছেরে ধীরেশ ! আমার বীরেশ, আমার অনাথ—

গণনাথ। তুমি মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হচ্ছো কেন বাবাজী ? বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে বুঝি ?

সুরেশ। মন ? বাড়ীর জন্যে ? হাঁ—না, না, মন কেমন করবে কেন ? বাড়ীর জন্যে আমার মন কেমন করেনি তো !

গণনাথ। তাহ'লে আরো অন্ততঃ দশটা দিন এখানে থাকবে তো ?

(নটবরকে লইয়া তপতীর প্রবেশ)

তপতী। বাবা ! নটবরকাকা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

গণনাথ। আরে এসো, এসো নটবর !

নটবর। (সুরেশ প্রণাম করিলে) থাক ! থাক ! রাজ-রাজ্যেশ্বর হও বাবা ! (তপতী প্রণাম করিলে) রাজরাণী হও মা ! তপা মা !

তপতী। কাকাবাবু !

নটবর। অনেকদিন তোমার হাতে চা খাইনি, একটু চা খাওয়াবে মা ? মনে আছে, তোমার হাতে চা খাওয়ার জন্যে আমি

এক মাইল পথ হেঁটে এসে গণনাথদা'র বাড়ীতে হানা দিতুম!

তপতী। বেশ, আমি এখুনি আনছি কাকাবাবু! (প্রস্থান)

নটবর। তারপর বাবাজী, কেমন আছো?

সুরেশ। ভালো আছি কাকাবাবু!

গণনাথ। বয়!

প্রাণেশ্বর। বাবু!

গণনাথ। তামাকটা পাল্টে খানিকটা অম্বুরি সেজে নিয়ে আয়! নটবর আবার কড়া তামাক খেতে পারেনা!

[হুঁকার মুখ হইতে কলিকাটি লইয়া প্রাণেশ্বরের প্রস্থান]

নটবর। তোমার বাড়ীর ওদিকে কাল গিয়েছিলুম বাবাজী! তোমার বাবার সঙ্গেও দেখা হ'লো!

সুরেশ। (ভীতকণ্ঠে) বা—বা!

নটবর। হ্যাঁ, সব শুনলুম। শুনে বড় দুঃখই হলো!

গণনাথ। দুঃখ! দুঃখ কেন নটবর?

নটবর। এই তপা-মা আর সুরেশের চলে আসার ব্যাপার—

গণনাথ। কেন, ওরা তো দুঃখ পাবার মত কোন কাজ করে আসেনি নটবর!

নটবর। তুমি কী কিছুই জানোনা গণনাথদা?

গণনাথ। আমি তো জানি ওরা দু'জনে বলে-কয়ে বেড়াতে এসেছে—

[দরজায় প্রাণেশ্বরের আবির্ভাব, হাতে তার জলন্ত কলিকা]

প্রাণেশ্বর। জামাইবাবু, আপনার ভাত বাড়া হয়েছেন।

সুরেশ। যাই! (উঠিল)

নটবর। সুরেশকে মহিমবাবু ত্যজ্যপুত্র করে দিয়েছেন।

গণনাথ। এঁ্যা! (হাত হইতে সংবাদপত্র পড়িয়া গেল) তুমি বলো কী নটবর ?

নটবর। হ্যাঁ গণনাথদা, মহিমবাবু বড় দুঃখে সমস্ত ঘটনা আমাকে বললেন।

গণনাথ। সুরেশ! ভাত পরে খেয়ো, এখন বসো! (সুরেশ পুনরায় বসিল) ব্যাপারটা আমাকে বলোতো নটবর!

নটবর। সুরেশ বেকার, মদ খায়, রাত্রে বাড়ী ফেরেনা, উপরন্তু ভাই-বোনদের মার-ধোর করে। এটা নাকি তার নিত্তনৈমিত্তিক কাণ্ড। তপতী শ্বশুরকে শ্রদ্ধা করেনা, দেওর ননদকে দু'চক্ষে দেখতে পারেনা এবং অনবরতঃ শ্বশুরের সংসার উচ্ছন্নে যাক—এই কামনাই করে। এত অশান্তির মধ্যেও মহিমবাবু বনস্পতির মত সমস্ত সহ্য করেছিলেন। শেষে সুরেশ একদিন কল্যাণীকে মারতে—

গণনাথ। কল্যাণীকে— ?

নটবর। হ্যাঁ কল্যাণীকে মারতে মহিমবাবু আর সহ্য করলেন না, সুরেশকে এবং তপতীকে বাড়ী থেকে বার করে দেন এবং জীবনের মত এদের ত্যাগ করলেন—এমন প্রতীজ্ঞাও নাকি করেছেন। তপতীর ব্যবহারে তিনি অধিক ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, দেখলুম।

গণনাথ। হুঁ! সুরেশ!

সুরেশ। আজ্ঞে!

গণনাথ। নটবার যা বললে, তার প্রতিবাদ তুমি করতে পারো ?

সুরেশ। আজ্ঞে না।

গণনাথ। বয়!

প্রাণেশ্বর। বাবু!

গণনাথ। তপতীকে ডাক!

[প্রাণেশ্বরের প্রস্থান ও তপতীসহ পুনঃ প্রবেশ]

তপতী। আমাকে ডেকেছো বাবা?

গণনাথ। হ্যাঁ। তোমার নটবরকাকার মুখে তোমাদের আসার কাহিনী যা শুনলুম, তা সত্য?

তপতী। কী শুনেছো, তা তো জানিনা বাবা। তবে আমার শ্বশুরই আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন।

গণনাথ। তুমি তাঁকে কী রকম দ্যাখো তপতী?

তপতী। আমি তাঁকে মোটেই দেখতে পারিনা বাবা।

গণনাথ। তোমার দেওর-ননদকে কী চোখে দ্যাখো তপতী?

তপতী। ঘৃণার চোখে দেখি বাবা। তারা সব এক-একটা মূর্খের জলন্ত উদাহরণ। বিশেষ করে আমার ননদটি একটি জন্তু-বিশেষ।

গণনাথ। তোমার শিক্ষার উপযুক্ত কথাই তপতী!

তপতী। কেন হবেনা বাবা? কলেজের বই আর বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগে যে অনেক তফাৎ বাবা। আমি তোমাদের চা আনিগে!

গণনাথ। দরকার হবেনা। এই দণ্ডে আমার বাড়ী থেকে তুমি সুরেশের হাত ধরে বেরিয়ে যাও!

তপতী। বা—বা!

গণনাথ। কল্যাণীর মত লক্ষ্মীকে যে অবহেলা করে, মহিম চৌধুরীর

মত দেবতাকে যে অশ্রদ্ধা করে, সে যেন ভবিষ্যতে আমাকে বাবা বলে না ডাকে।

তপতী। বাবা! বাবা! এ তুমি কী বলছো বাবা? আমি যে তোমার তপা!

গণনাথ। বিয়ের আগে বাপ-মা মেয়েদের শিক্ষা দেন শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে লক্ষ্মীর আসনে বসবার উপযুক্ত করবার জন্যে। আমি তোমাকে সেই বিশ্বাসেই যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছিলুম, কিন্তু তুমি শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে অলক্ষ্মীর আসনটাকেই বেছে নিয়েছো।

তপতী। বাবা!

নটবর। এবারটার মত ওদের ক্ষমা করো গণনাথদা'। তুমিই বরং মহিমবাবুকে ধরে একটা মিটমাট করে দাও!

গণনাথ। না নটবর! মহিম চৌধুরী যে বিচার করেন, গণনাথ রায় তার ওপর কথা বলতে পারেনা। মহিম চৌধুরীকে আমি চিনি। সুরেশ, দেরী কোরনা!

প্রাণেশ্বর। জামাইবাবুর ভাত বাড়া পড়ে রয়েছেন বাবু!

গণনাথ। ভাত ভিখিরীকে দিতে বলগে! এদের ভাত দিলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে।

তপতী। আমরা কোথায় যাবো বাবা?

গণনাথ। আমি তা জানিনা। তোমরা আর দেরী কোরনা, চলে যাও! দেরী করলে ওই চাকরটা তোমাদের যেতে সাহায্য করতে বাধ্য হবে।

সুরেশ। (তপতীর হাত ধরিয়া) চলে এসো।

তপতী। (কাঁদিয়া) বা—বা! বা—বা—

[ক্রন্দনরতা তপতীকে লইয়া সুরেশের প্রস্থান]

নটবর। কাজটা তুমি বোধহয় ভালো করলেনা গণনাথদা!

গণনাথ। এঁ্যা! না, না! ভালো করেছি, আমার মন বলছে আমি ভালোই করেছি! নটবর! নটবর! ঘরের জানলা দরজা-গুলো সব বন্ধ করে দাও, শীগগির বন্ধ করে দাও! আমি রায়বাহাদুর হ'লেও মানুষ······বন্ধ করো, বন্ধ করো······

[নেপথ্যে তখনো তপতীর কণ্ঠে শোনা যাইতেছে 'বাবা-বাবা' এবং তাহা ক্রমশঃ দূরে মিলাইয়া যাইতেছে। গণনাথ পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় অভিনয় করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। নটবর জানালা-দরজা বন্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ড্রপ নামিয়া আসিল।]

তৃতীয় অঙ্ক

[দুই বৎসর পর। মহিম চৌধুরীর সে পুরানো বাড়ী নাই, বর্তমানে সেখানে একখানা ক্ষুদ্র অট্টালিকা উঠিয়াছে। দৃশ্য উঠিলেই দেখা যাইবে—রোয়াকের উপর মহিমেরই প্রতিবেশী শ্রীনাথ, গোবর্ধন, নিরঞ্জন ও বিশ্বম্ভর বসিয়া রহিয়াছে।]

বিশ্বম্ভর। সে মহিম আর আজকাল নেই হে, সে মহিম আর আজকাল নেই!

নিরঞ্জন। আর কেনই বা থাকবে বলো? এখন তো আর সে তোমার-আমার মত নেই। সে এখন দু' চারটে কিনতে পারে।

গোবর্ধন। ওরকম ভুঁইফোঁড় বড়লোক ঢের দেখেছি হে! কিন্তু এরকম দেমাক আমি এতখানি বয়স হ'লো কোথাও দেখিনি।

শ্রীনাথ। আমার বড় সম্বন্ধির বড় সাহেবের কথাই ধরনা। সেও তো হঠাৎ বড়লোক হয়েছে, কিন্তু আমাদের কী রকম সমীহ করে কথা বলে—বলো দেখি বিশ্বম্ভর!

বিশ্বম্ভর। তোমার বড় সম্বন্ধির বড় সাহেবকে তো আমি দেখিনি শ্রীনাথ!

শ্রীনাথ। দ্যাখোনি? দেখেছো নিশ্চয়ই, হিংসায় স্বীকার করছোনা!

বিশ্বম্ভর। হিংসা! আমার হিংসা হতে যাবে কেন? এই মহিম হঠাৎ বড়লোক হয়েছে—তাতে কী আমাদের কিছু কষ্ট হচ্ছে?

নিরঞ্জন। (ব্যথিত চিত্তে) মোটেই না!

গোবর্ধন। তাছাড়া হিংসা হবার মত কোন কারণও তো দেখিনা। বলি, সে তো আর নিজের রোজকারে বড়লোক হয়নি? হয়েছে তার ছেলে ধীরেশের রোজকারে!

নিরঞ্জন। হ্যাঁ ছেলেটা ভেল্কি দেখালে হে, তাজ্জব করলে। সামান্য দু'টো বছরের মধ্যে কোথা দিয়ে যে কী করলে!

শ্রীনাথ। তাও জানোনা বুঝি?

নিরঞ্জন। না।

শ্রীনাথ। আর জানবেই বা কেমন করে? এসব ভেতরের ব্যাপার কীনা! (নিম্নকণ্ঠে) খদ্দরের টুপি মাথায় দিয়ে ধীরেশ কালো বাজারে ঘোরে—

গোবর্ধন। আমিও তো সেই কথা আমাদের বাড়ীতে বলছিনুম, কিন্তু তারা বিশ্বাসই করেনা। বলে, মিলিটারী কাজ করে—

শ্রীনাথ। তোমার বাড়ী একটা আস্তো মেয়েছেলে কীনা!

গোবর্ধন। শুধু তাই? আমাকে এই বয়সে বলে কীনা—যুদ্ধে যাও!

শ্রীনাথ। মেয়েছেলের বুদ্ধিই ওই রকম। এই মহিমের মেয়ে কল্যাণীকেই ছাখোনা। বাপ-ভাই—সবাই ওর কাছে জুজু!

বিশ্বম্ভর। এইবার উচ্ছন্নে যাবে। মেয়েছেলের মতে সংসার? উচ্ছন্নে যাবে, উচ্ছন্নে যাবে!

শ্রীনাথ। মহিমের গুমোরটাও লক্ষ্য করেছো তো? সব সময় মুখ হাঁড়ি করেই আছে। কেন রে বাপু?

নিরঞ্জন। এটা আর বুঝছোনা? ছিল আঙুল, হয়েছে কলাগাছ। ছিল টুনটুনি, হয়েছে বাজপাখী!

শ্রীনাথ। সেইজন্যেই তো সেদিন সইতে না পেরে মহিমের মেয়েটাকে বেশ করে শুনিয়ে দিলুম—

বিশ্বম্ভর। দিলে? শুনিয়ে দিলে?

শ্রীনাথ। হ্যাঁ! আচ্ছা করে' দু' কথা শুনিয়ে দিলুম।

গোবর্ধন। মেয়েটা কিছু বললেনা?

শ্রীনাথ। বলবে আবার কী? বললে, বড়দা চলে যাবার পর থেকে বাবা এরকম হয়ে গেছে। যা ভেবেছো, তা নয়!

[একটি মাতুর লইয়া কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী। আজও ঠিক সেই কথাই বলছি শ্রীনাথকাকা। আজ দু'বছর হলো বড়দা নেই, দু'বছর ধরেই বাবার মুখে হাসি নেই। তোমরা মাতুরে বসে কথা কও! (মাতুর পাতিয়া দিল)

শ্রীনাথ। থাক, আর মাতুর দিতে হবেনা। আমরা কী মাতুরে বসবার যুগ্যি?

গোবর্ধন। গরীব আমরা হতে পারি, কিন্তু পাড়ার লোকের সঙ্গে মিশি!

কল্যাণী। তোমাদের সঙ্গে মিশতে বাবারও তো অনিচ্ছা নেই। কিন্তু তাঁর শরীরটা আর মুখখানা এই দু' বছরের মধ্যে তোমরা কী কেউ একবারও ভাখোনি?

শ্রীনাথ। তা আর দেখিনি! দেখেছি যেন জাহাজ ডুবে গেছে, দেখেছি যেন জমিদারী লাটে উঠেছে—

কল্যাণী। বাবাকে তোমরা ওরকম ধারণা কোরনা শ্রীনাথকাকা।

শ্রীনাথ। না করবেনা! বলি, আমরা তো পাড়া-প্রতিবাসী—আমাদের সঙ্গে কী তার জোর করেও হেসে কথা কওয়া উচিত নয়?

তোমাদের বিষয় তো আমাদের জানতে কিছু বাকী নেই মা! কী বলো হে নিরঞ্জন?

নিরঞ্জন। নিশ্চয়ই!

কল্যাণী। সেকথা আমরাও তো অস্বীকার করছিনা। তার জন্যে বাড়ী পর্য্যন্ত এসে আমার বাবাকে তিরস্কার না করলেও পারতেন।

বিশ্বম্ভর। তিরস্কার নয় কল্যাণী। আমরা বড় ব্যথা পেয়েছি।

কল্যাণী। লোকের প্রাণে ব্যথা দেবার মত কোন কাজ আমার বাপ-ভাই তো করেনি বিশ্বম্ভর কাকা!

বিশ্বম্ভর। করেছে মা, সে তুমি বুঝবেনা। যাক, মহিমদা কোথায়?

কল্যাণী। বাবা কোথায় বেরিয়েছেন, এখুনি ফিরবেন।

[মহিমরঞ্জনের প্রবেশ; পরণে একখানি ন' হাতি ধুতি, গায়ে একটা ফতুয়া, কাঁধে একটা দামী কোট ঝুলানো, হাতে লাঠি। চেহারা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দু' বছরের ব্যবধানে দশ বছরের ছাপ।]

গোবর্ধন। ওই যে আসছে!

মহিম। কী খবর? এমনভাবে সব যে? কোথায়?

শ্রীনাথ। তোমার বাড়ীতে যখন এসেছি, তখন লাটসাহেবের বাসভবনে যাবোনা নিশ্চয়ই!

মহিম। আমি সেকথা বলছিনা শ্রীনাথ!

বিশ্বম্ভর। তুমি কী একটু হেসে কথা কইতে পারোনা মহিমদা?

মহিম। হাসতে আমি ভুলে গেছি ভাই!

শ্রীনাথ। কথাটা ঠিকই, পয়সার গরম কীনা!

মহিম। অমন কথা বোলনা শ্রীনাথ, ব্যথা পাই। যাক, আমাকে কী তোমাদের কিছু বলবার আছে?

নিরঞ্জন। নিশ্চয়ই আছে। বলোনা হে গোবর্ধন।

গোবর্ধন। আমার মেয়ের বিয়ে। কিছু সাহায্য চাই।

মহিম। ভালো কথা। কত চাই ভাই গোবর্ধন?

গোবর্ধন। শ' দুই হলেই হবে।

মহিম। কাল নিয়ে যেও। ধীরেশকে আমি বলে রাখবো'খন। এখন আমি যাচ্ছি, শরীরটা আমার বিশেষ ভালো নেই।

[প্রস্থান]

শ্রীনাথ। দেখলে? বলি দেখলে তো? পয়সার গরম কাকে বলে দেখলে তো? দু'শো টাকা দিয়ে উনি যেন আমাদের কেতাথ করে দিলেন! ছোটলোক! ছোটলোক!

বিশ্বম্ভর। চলো, চলো! আর এখানে থাকতে আছে? কাল একসময় এসে তুমি টাকাটা নিয়ে যেও হে গোবর্ধন!

নিরঞ্জন। আমার বাবার শ্রাদ্ধের সময়ও অমনি। আড়াইশো টাকা সাহায্য করে সে কত চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা! বলে, বুঝে-সুজে খরচ কোরহে নিরঞ্জন, বুঝে-সুজে খরচ কোর! ইচ্ছে হোল, দিই নোট ক'খানা ফেলে—

শ্রীনাথ। দিলেনা কেন?

নিরঞ্জন। দিলে যে আবার বাবার শ্রাদ্ধই হয়না!

শ্রীনাথ। হুঁ! চলো, চলো! কিন্তু একথা তুমি জেনে রেখো নিরঞ্জন —এত দর্প ভগবান সইবেননা। আজ এখানে দান, কাল সেখানে সাহায্য! যাবে, শীগগির যাবে!

[সকলের প্রস্থান]

[বাহির হইতে প্রবেশ করিল বীরেশ, বিজয় ও নরেন]

বীরেশ। না ভাই, বাবা যে রাজী হবেন—এতো আমার মনেই হয়না।

বিজয়। কিছুতো বলতে হবেনা, শুধু সভাপতির আসনে বসে থাকা—

বীরেশ। তাহ'লেও হবেনা, বাবা আর সে মানুষ নেই। আমাদের পর্যন্ত কথা কইতে ভয় হয়।

নরেন। তোর দাদার কথা যেটা বললুম, সেটা হবে তো?

বীরেশ। হ্যাঁ সেটা নিশ্চয়ই। ক্লাবের জন্যে সাহায্য ও আমি দাদার কাছ থেকে নিতে পারবোই।

বিজয়। কিন্তু তোর বাবাকে সভাপতি করবার আমাদের বড্ড ইচ্ছে ছিল ভাই!

বীরেশ। কী হবে বল? বড়দাই বাবাকে এমন করে গেছেন।

বিজয়। আমরা তোর বাবাকে একবার বলে' দেখবো বীরেশ?

বীরেশ। বলতে পারিস, তবে হবে বলে' তো আমার মনে হয়না। আচ্ছা দাঁড়া, বাবা বাড়ীতে আছেন কীনা দেখি। দিদি! দিদি!

[কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী। কীরে বীরেশ?

বীরেশ। বাবা কোথায় দিদি?

কল্যাণী। বাবার শরীরটা খারাপ, শুয়ে পড়েছেন।

বীরেশ। দেখলি তো বিজয়! বাবার আশা ছেড়ে দে ভাই।

[ঘরের ভিতর হইতে মহিমের প্রবেশ]

মহিম। তোমাদের কথাবার্তা আমি ঘরের ভেতর থেকেই শুনতে পাচ্ছিলুম বাবা। কিন্তু আমাদের আর কেন? একটা

বুড়োকে থামের মত বসিয়ে রেখে তোমাদের চিরচঞ্চল চিত্ত কী আনন্দ পাবে বাবা ?

বিজয়। আপনাদের মত একজন আমাদের মধ্যে থাকলে কিছু না হোক অন্ততঃ একটা বেশ শৃঙ্খলা থাকে।

নরেন। আমরা এতো চঞ্চল যে, নিজেদেরকেও বিশ্বাস করতে পারিনা। তাই আপনাদের মত একজনকে আমাদের চাই।

বিজয়। আপনাকে কিছুই করতে হবেনা, শুধু সভাপতির আসনে বসে থাকবেন। তাতেই আমরা যথেষ্ট উৎসাহ পাবো।

মহিম। বেশ! তাই যদি হয়—আমার উপস্থিতিতে তোমরা যদি উৎসাহ পাও, আমি যাবো। কখন যেতে হবে বাবা ?

বিজয় ও নরেন। এখুনিই !

মহিম। এখুনিই ? (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা! মা কল্যাণী, আমার কোট আর লাঠিগাছটা তবে—

কল্যাণী। তোমার শরীর যে খুব খারাপ বাবা !

মহিম। তা হোক, তুই আমার কোট আর লাঠি গাছটা এনে দে! এরা হ'লো বাংলার ভবিষ্যৎ, জাতির মেরুদণ্ড। এদের উৎসাহকে, উদ্দীপনাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়রে মা!

কল্যাণী। কিন্তু শরীরটা যে তোমার—

মহিম। পাগলী কোথাকার! যা নিয়ে আয়! (কল্যাণী ঘরের মধ্যে আনিতে গেলে) মনে বড় আশা ছিল, আমরা যা সফল করতে পারিনি, তোমরা তা করবে—আর আমরা তা দেখতে-দেখতে শান্তিতে চোখ বুজোবো! কিন্তু—

কল্যাণী। (কোট-লাঠি দিয়া) বাবার দিকে একটু নজর রাখিস বীরেশ!

মহিম। (সহাস্যে) তুই নিশ্চিন্তে থাকরে মা, বাবা তোর রাস্তায় পড়ে মরবেনা। চলো, চলো বাবা!

[প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় ধীরেশের প্রবেশ; পরনে খদ্দরের পোষাক।]

ধীরেশ। কোথায় যাচ্ছো বাবা?

মহিম। বীরেশদের ক্লাবে কী একটা মিটিং আছে—

বীরেশ। মিটিং নয়, ফুটবল খেলার প্রাইজ ডিস্‌ট্রিবিউশান্—

মহিম। তাতে আমাকে সভাপতি করতে চায়, তাই যাচ্ছি।

ধীরেশ। তা এই বেশে? এই ন' হাতি কাপড় আর ফতুয়া পরে?

মহিম। (কাঁধে ঝুলানো কোট দেখাইয়া) কেন, এই তো তোর দু'শো টাকা দামের কোট রয়েছে—

ধীরেশ। ওটা তো কেনা পর্যন্ত তোমাকে একদিনও পরতে দেখলুমনা। আজ একটা অনুষ্ঠানের সভাপতি হতে যাচ্ছো, ওটা গায়ে দাওনা বাবা!

মহিম। আমাদের চৌধুরী বংশ হ'লো এই অঞ্চলের বনেদী বংশ, তাকে চেনাবার জন্যে দু'শো টাকা দামের কোট গায়ে চড়াতে হয়না ধীরেশ!

বিজয়। বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে!

মহিম। হাঁা চলো বাবা! আসি মা কল্যাণী!

[কল্যাণী ও ধীরেশ ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

ধীরেশ। বাবা কিছুতেই আমার কথা শুনবে না। এত পয়সা রোজকার করলুম, কিন্তু মনের মত করে বাবার সেবা আমি করতে পারলুমনা।

কল্যাণী। বাবার জন্যে তুই ভাবিসনে ধীরেশ!

ধীরেশ। না, না, এর মানেটা কী? কোটটা শুধু ঘাড়ে করে বেড়াবার মানেটা কী হয় আমাকে বলতে পারো?

কল্যাণী। মানে কিছুই নেই ধীরেশ! কোন সুখে বাবা আবার ওসব পরে বেড়াবেন বলতো? তুই ভাবিসনে।

ধীরেশ। না ভাববেনা! যদিনা বাবাকেই সুখী করতে পারলুম, যদি না গুরুজনদের মুখে হাসি ফোটাতে পারলুম, তাহ'লে এ পয়সায় আমার লাভ কী দিদি?

কল্যাণী। অমন কথা বলিসনে ধীরেশ! তুই কত লোকের কত সাহায্য করছিস, কত দান-ধ্যান করছিস—এটা কী কম ভাই?

ধীরেশ। ওসব মন-ভুলানো কথা তুমি রেখে দাও দিদি! ঘর-বাড়ী করেছি, দান-ধ্যান করছি—এসব কী শুধু আমারই জন্যে? বলি, আমি কী কেবল যখের মত সারাজীবন এগুলো আগ্‌লেই বেড়াবো?

কল্যাণী। ধীরেশ!

ধীরেশ। চুপ করো! ধীরেশ, ধীরেশ, আর ধীরেশ! কিসের জন্যে আমি এ সংসার আকড়ে বসে থাকবো? যারা ভোগ করবে, যাদের সংসার—আজ কোথায় তারা? কোথায় দাদা, কোথায় বৌদি? আমি জানি, একদিন ঠিক এসে হাজির হবে, বাড়াভাতে হাত ধুয়ে ঠিক বসে যাবে। কিন্তু তার

আগে আমি কী করবো জানো? এই সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে একদিকে চলে যাবো!

কল্যাণী। তাই দিস! তোর জিনিষ, তোর যা ইচ্ছে তাই করিস্!

ধীরেশ। আমার জিনিষ!

কল্যাণী। হ্যাঁ তোরই তো! তুই নিজে করেছিস!

ধীরেশ। তারপর হাতে দড়ি পড়ুক, লোকে বলুক—নিজের দাদা-বৌদিকে ফাঁকি দিয়ে ধীরেশ চৌধুরী সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে করে নিয়েছে। খুব ভালো হবে?

কল্যাণী। ভালো হবে কী মন্দ হবে, তা আমি কী জানি? আমায় তুই বিরক্ত করিসনে ধীরেশ!

ধীরেশ। বিরক্ত! হ্যাঁ এখন তো বিরক্ত হবেই! উঃ, বড়লোক হওয়াটা তো আমার কাছে দেবতার আশীর্বাদ হ'লোনা, হ'লো অভিশাপ!

কল্যাণী। তাদের নিয়েই বা কেন এসব গণ্ডগোল পাকাচ্ছিস? তারা যাকগে না যেখানে গেছে, কেন তুই এরকম পাতি-পাতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছিস?

ধীরেশ। কেন খুঁজছি, তা তুমি জানবে কেমন করে? বলি, আইন যখন হ্যাণ্ড্কাপ্ নিয়ে আসবে, তখন সে যে খুঁজবে এই ধীরেশ চৌধুরীকেই! লোকে যখন গালাগালি দিয়ে বেড়াবে, তখন সেটা লাগবে যে এই ধীরেশ চৌধুরীরই গায়ে! নিকনা, তারা এসে তাদের সম্পত্তি চুল-চিরে ভাগ করে নিকনা!

কল্যাণী। আজ দু' বছর পাগলের মত তুই দাদা-বৌদিকে খুঁজে

বেড়াচ্ছিস ধীরেশ, শুধু কী এই হ্যাণ্ডকাপ আর লোক নিন্দের ভয়ে ?

ধীরেশ। তা নয় তো কী! এই তো আজও দাদার শ্বশুরবাড়ীতে আমি খবর জানতে গিয়েছিলুম—

কল্যাণী। ও! তারা কী বললেন ?

ধীরেশ। বললেন, দু' বছর আগে সেই যে তারা চলে গিয়েছে, তারপর থেকে আর কোন খবরই তারা জানেননা।

কল্যাণী। ও! বেশ হয়েছে। [প্রস্থানোদ্যত]

ধীরেশ। দিদি!

কল্যাণী। কী ?

ধীরেশ। মুখ ভারী করে' কোথায় যাচ্ছো ?

কল্যাণী। আমার কী সংসারের আর কোন কাজ নেই ?

ধীরেশ। (হাত ধরিয়া টানিয়া) বলি, এটাও কী একটা সংসারের কাজ নয় ? এই যে—(কল্যাণী মুখ ঘুরাইয়া চোখের জল মুছিল) ও কী! কাঁদছো তুমি ? তা তো কাঁদবেই! দাদাকে গাল দিয়েছি আর কী চোখে জল রাখা যায় ?

কল্যাণী। তোর যত ইচ্ছে তুই তাকে গাল দেনা ধীরেশ—

ধীরেশ। দেবো তো! একশোবার দেবো! কিন্তু এই শত্তুরের সংসারে থেকে তুমি চোখের জল ফেলবে, বাবা মুখ ভার করে থাকবে —আমি তা কেমন করে সহ্য করি বলো তো ?

কল্যাণী। আর আমি চোখের জল ফেলবোনা ধীরেশ, আর আমি কিছু বলবোনা!

ধীরেশ। আমি জানি, দাদা-বৌদিই তোমাদের সব! তাদের জন্যে

তুমি আর বাবা দিবারাত্র রাবণের চিতা বুকে জেলে বেড়াচ্ছো! আমি তোমাদের শত্তুর, তোমাদের চক্ষুশূল!

কল্যাণী। এ কী তুই বলছিস ধীরেশ?

ধীরেশ। ঠিক বলছি গো, ঠিক বলছি! আমি বোকা হতে পারি, কিন্তু মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কিছু-কিছু বুঝি! বাবার বুকে যে শেল বিঁধেছে, তোমার বুকে যে রাবণের চিতা জ্বলছে—তার তুলনায়…তার তুলনায়—(চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা লুকাইতে প্রস্থানোদ্যত)

কল্যাণী। ধীরেশ!

ধীরেশ। কী! কী!! কী!!! [ছুটিয়া ভিতরে প্রস্থান]

কল্যাণী। সত্যি কথা ধীরেশ! দাদা আমাকে ছোটবেলা থেকে অনেক মেরেছে, বকেছে সত্যি, কিন্তু যে স্নেহ, যে ভালোবাসা দাদা আমাকে দিয়েছে, তা যে আমি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ভুলতে পারবোনারে! [প্রস্থান]

[অনাথ ও বিশে নামে অপর একটি ছেলে বাহির হইতে প্রবেশ করিল। পোষাক-পরিচ্ছদে অনাথ একটি ক্ষুদ্র নবাব বিশেষ। বিশে চেহারায় কুশ্রী, পরিচ্ছদে দরিদ্র এবং বচনে তোৎলা।]

অনাথ। আমার নতুন বইখানা দেখেছিস বিশে?

বিশে। কো কো-কোন্‌টা ভাই?

অনাথ। (ভেঙচাইয়া) কোন্‌টা ভাই! সারা দেশ তোলপাড় করে ফেললো যে বইখানা, সে বই তুই এখনো দেখিসনি? অস্তরাগরে, অস্তরাগ!

বিশে। না ভাই, এখনো দেখিনি। দু' দিন টিকিট কাটতে গিয়ে ফিরে এসেছি! তোর কী পার্ট ছিল-ছিল-ছিলো ভাই?

অনাথ। মব্ সিন্!

বিশে। কী বল-বল-বললি?

অনাথ। মব্ সিন্!

বিশে। মব্ সিন্ কী ভা-আ-আ-ই?

অনাথ। তুই একটা গাধা, বুঝলি স্টুপিড্, তুই একটা আস্তো এ্যাস্! (ভেঙচাইয়া) মব্ সিন্ কী ভাই!

বিশে। তুই আম-আম-আমাকে গাল দিচ্ছিস অনাথ?

অনাথ। না দেবেনা! এ যুগের ছেলে হয়ে সিনেমার কিছু জানেনা, ওকে গাল দেবেনা! লোকের কাছে পরিচয় দেবার অযোগ্য!

বিশে। কই, ওই মান্-মান্-মানেটা তো বললিনি?

অনাথ। মব্ সিন্? মব্ সিন্ মানে ভীড়ের দৃশ্য!

বিশে। ভীড়ের দৃশ্-দৃশ্-দৃশ্যে তুই নেমেছিস? হ্যাঁ ভাই, তোকে দেখা যায়?

অনাথ। নিশ্চয়ই! দেখবি সভার দৃশ্যে আমি একেবারে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

বিশে। ভাই অনাথ, আমি নামবো ভাই!

অনাথ। তুই নামবি ছবিতে? হা-হা-হা···

বিশে। কেন পার-পার-পারবোনা? আমার গল-গল-গলা ভালো! দেখতেও মা বলে, আম-আম-আমি চাঁদের মত! দেখবি এক-এক-একখান্ রাম পেস্-পেস্-পেসাদ ধরবো? দাঁড়া:

মা আম-আম-আমায় ঘুরাবি কত ?
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত !
মা আম-আম-আম—

অনাথ। থাম্! তোকে আর আম-আম করতে হবেনা। সিনেমায় নামা তোর কর্ম নয়। নামতে কত খরচ জানিস ?

বিশে। খ-র-চ !

অনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ চাঁদ! নইলে কী এমনি ? আমার ওই মব্ সিনটায় নামতে কত খরচ পড়েছে জানিস ? একশোর ওপর !

বিশে। একশোর ওপর ?

অনাথ। হ্যাঁ মশায়! আবার যে বইটায় ফের নামছি, তাতে ভিখিরীর হাতে পয়সা দেবো—এমন একটা চান্স্ পাবো। তাতেও বেশ খানিকটা খরচ হবে !

বিশে। তুই এত-এত-এতো টাকা কোথ-কোথ-কোথায় পাস ভাই অনাথ ?

অনাথ। মেজদা দেয়। তোর তো আর মেজদা নেই !

বিশে। তোর বাবা বক্-বক্-বকেনা ?

অনাথ। সে কথা আবার বলতে ? কিন্তু মেজদার কাছে একবার কাঁদলেই—ব্যস ! যা, যা ! সেসব ভেতরের ব্যাপার তুই বুঝবিনে, যা ভাগ্ !

বিশে। আম-আম-আমার কী হবে ভাই ?

অনাথ। এখন যা বলছি, বিরক্ত করিসনে ! অন্য সময় আসিস্ !

বিশে। যাচ্ছি, কিন্তু একটা চান্-চান্-চান্স আমায় দিস অনাথ !

অনাথ। চান্স্ ! চান্স্ যেন একেবারে গাছের ফল যে পাড়লেই হয়ে

গেল! এই একটা মব্ সিনে নামতে আমাকে যে কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে, তা আমিই জানি। একবার একে ধরো, একবার তাকে ধরো, একবার এর কাছে যাও, একবার তার কাছে যাও—বাপস্!

বিশে। এত্-এত্-এতো ব্যা-ব্যা-পার ?

অনাথ। দিদি বোধহয় রাঁধছে, মেজদা বোধহয় কারখানায়—এই সুযোগে আমার ভিক্ষে দেবার সিন্‌টা একবার রিহার্সাল দিয়ে নিই! এই বিশে, দাঁড়া!—(গমনোদ্যত বিশে দাঁড়াইলে ঘরের ভিতর হইতে একটি গামছা ও রেকাবী আনিয়া গামছাটি ঝুলি করিয়া) নে, এইটে কাঁধে ঝুলো দেখি! আমি তোকে ভিক্ষে দেবো! (রেকাবী হাতে ঘরের মধ্যে গিয়া এবং নাটকীয়ভাবে বাহির হইয়া) 'এই নাও ভিক্ষুক, আর কিছু নাই।' (রেকাবীটি উপুড় করিয়া দিল বিশের ঝুলিতে)

বিশে। (শূন্য ঝুলি দেখিয়া) কই, কিছু দিস্-দিস্-দিস্‌নিতো অনাথ! মাইরি, এই ত্যাখনা ঝুলি একেবারে খাল্-খাল্-খালি!

অনাথ। একটা গবেট্ তুই! ভিক্ষে কী আমি তোকে সত্যি-সত্যি দিলুমরে গাধা ? ওটা হলো অভিনয়! নে আবার রেডি হ'! আমি তোকে আবার ভিক্ষে দেবো। হয়েছে ?

বিশে। হয়েছে।

অনাথ। (একটা কাঠের সহিত অপর একটি কাঠের শব্দ করিয়া) স্টার্ট্!

বিশে। (পড়িয়া গিয়া) বা-বা-রে!

অনাথ। তাহ'লেই হয়েছে! তাহ'লেই তুই সিনেমায় নেমেছিস! সামান্য একটা ক্লাপস্টিকের শব্দে তুই চমকে উঠলি—?

বিশে। তুই যে আচমকায় করলি!

অনাথ। আচমকাতেই ওটা হয় মশায়! সিনেমার ছবি তোলা তো আর কখনো দেখিসনি! নে, আমি আবার স্টার্ট্ বলবো। রেডি?

বিশে। (ভয়ে-ভয়ে) রেডি!

অনাথ। (ঝুলি কাড়িয়া) ভাগ্, ভাগ্! তোর এখনো অনেক দেরী! তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না! ভাগ্!

বিশে। তুই বড়্-বড়্-বড়্ডো যাতা বলছিস্ মাইরি!

অনাথ। আবার কথা কয়? যা, ভাগ্ বলছি! যত ভাবি তোদের সঙ্গে কথা কয়ে নিজের ইজ্জৎ খোয়াবোনা, তত সব এসে বিরক্ত করবি! ভাগ্!

[বিফল মনোরথ হইয়া বিশে প্রস্থান করিল। অনাথ তখন থামের গায়ে গামছা টাঙাইয়া নিজে নিজেই সিনের রিহার্সাল দিতে থাকিল। এমন সময় কাঁধের উপর হাফ্ সার্টটি ফেলিয়া হাত মুছিতে-মুছিতে দ্রুত প্রবেশ করিল ধীরেশ, পিছন-পিছন কল্যাণী। ধীরেশের কণ্ঠ পাইয়াই অনাথ ছুটিয়া প্রস্থান করিল।]

ধীরেশ। না, না, না! আমি কিছুতেই খাবোনা, কিছুতেই না।

কল্যাণী। আমার দিব্য ধীরেশ, ভাত ক'টা খেয়ে নে!

ধীরেশ। যত দিব্যিই তুমি দাও দিদি, আজকের ভাত আমি কিছুতেই

খাবোনা। কেন, কিসের জন্যে তুমি এই বাইশ-চব্বিশ রকমের তরকারী রেঁধেছো, শুনি?

কল্যাণী। বললুম তো আজ বড়দার জন্মদিন!

ধীরেশ। বড়দার জন্মদিন তো আমার তাতে কী? কোথায় সে লোকটা আছে তার ঠিক নেই, অথচ বাড়ীতে বসে হচ্ছে তার স্মৃতিপূজা! ধীরেশ চৌধুরীর পয়সাটা খুব সস্তা দেখেছো—না?

কল্যাণী। অমন করে তুই বলিস্‌নি ধীরেশ!

ধীরেশ। তা কীরকম করে বলবো, বলো! ত্যাগ যাকে করা হয়েছে, যার নাম মুখে পর্যন্ত আনা হয়না, সেই লোকটার জন্যে সেই ভোর থেকে উঠে ঘটা করে রেঁধে তুমি তার জন্ম-দিনের উৎসব পালন করছো। গত বছর—গত বছরও তুমি ঠিক এমনি করেছো।

কল্যাণী। কিন্তু ভোর না হতে তুই-ই তো এই এতো রকম রাঁধবার জন্যে বাজার করে নিয়ে এলি ধীরেশ!

ধীরেশ। নিয়ে এলুমতো! শুনেছিলুম, লোকটা নাকি এই শহরেরই কাছাকাছি কোথাও আছে। তাই ভেবেছিলুম, জন্মদিনের কথাটা যদি তার মনে পড়ে—যদি ভুলেও একবার সে—

কল্যাণী। মা যখন ছিলেন, প্রতি বছরেই এই দিনটিতে কত রকম রেঁধে তিনি বড়দাকে খাওয়াতেন। মা মরে যাবার পর আমি সেই কাজ করে আসছি এত বছর ধরে। আজ দাদা নেই বলে, কী করে,—ওরে কেমন করে এই দিনটিকে ভুলবো ধীরেশ?

ধীরেশ। ওই ছাখো, আবার গলা ভারী করে। বলি, দিনরাত্তির

আমি কী কেবল তোমাদের কান্নাই শুনবো ? বাবা থাকবে মুখ ভার করে, তুমি কথায়-কথায় কাঁদবে, তাহলে আমি কী করে শান্তিতে থাকি, বলোতো ?

কল্যাণী। তোর শান্তির ব্যাঘাত আমি করবোনা ধীরেশ, তুই খাবি আয়।

ধীরেশ। না, আমি কিছুতেই খাবোনা। তোমরা ভাবো, ধীরেশ চুপ করে বসে আছে, তোমরা মনে করো, দাদা চলে গেছে বলে ধীরেশের আনন্দ আর ধরেনা। হ্যাঁ তাই, সত্যিই তাই! কেন হবে না ? নিশ্চয়ই হবে। আমার খুব আনন্দ, খুব আনন্দ! (শত চেষ্টা সত্বেও দুই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইতে থাকিল।)

কল্যাণী। ধীরেশ!······ধীরেশ তোর চোখে জল!······ধীরেশ, তুই কাঁদছিস······!

ধীরেশ। (তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া শক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া) চোখে জল······মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা! আমি কাঁদিনি, আমি আনন্দ করছি। দেখছো না, তাকে বিদেয় দিয়ে আমি কেমন বাড়ী করেছি, পোষাক পরেছি, বড় হয়েছি······ আমি কাঁদতে পারিনা! [প্রস্থানোদ্যত]

কল্যাণী। কিন্তু তুই যাচ্ছিস কোথায় ?

ধীরেশ। খুঁজতে—তাকে খোঁজবার অভিনয় করতে। কিন্তু হ্যাঁ, একটা কথা আজ তোমাকে বলে যাই দিদি। যদি সেই আপদটাকে, সেই শনিটাকে, আমার সেই পথের কাঁটাটাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারি, তবে—তবেই আমি ফিরবো, নইলে—

কল্যাণী। (ভীতভাবে) নইলে, কী ?

ধীরেশ। নইলে ? নইলে আর এমন কিছু নয়—ছোট্ট একটুখানি কথা। তাকে না পেলে আমি—আমি আর ফিরবোনা !

[প্রস্থান]

কল্যাণী। ধীরেশ ! ধীরেশ !······তাইতো, ধীরেশ যে চলে গেল। বাড়ীতেও যে কেউ নেই। ওরে বীরেশ, ওরে অনাথ, ধীরেশ যে চলে গেলরে ! (এমন সময় বীরেশ ও নরেনের কাঁধে ভর দিয়া মহিমকে ফিরিতে দেখিয়া কল্যাণী তাড়াতাড়ি তাঁহাকেই বলিতে ছুটিয়া গেল, কিন্তু কাছে গিয়া তাঁহার রোগবিবর্ণ, ব্যথা-করুণ মুখের দিকে চাহিতেই সে ভয়ে-আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল) এ কী ! বাবা !···বাবা !!

[মহিমবাবু অসুস্থ—ভীষণ অসুস্থ। ড্রপ।]

চতুর্থ অঙ্ক

[একটি অপরিচ্ছন্ন বস্তী। নানান্ রকমের মানুষের বাস এখানে। ভিখারী, পকেটমার, চোর, জুয়াচোর—চকচকে সহরে যাহাদের ঠাঁই হয়না, তাহারা কোনরকমে এখানে পেচকের ন্যায় মাথা গুঁজিয়া থাকে। এখানে থাকে বিখ্যাত পকেটমার কমিরুদ্দি, ভিক্ষা উপজীবিকা করিয়া যাহারা পথে-ঘাটে নাচিয়া-গাহিয়া বেড়ায় সেই নন্দলাল ও চামেলী। আর ইহাদেরই মাঝে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে সুরেশ এবং তপতী। বর্তমানে তপতী অত্যন্ত অসুস্থা ও রুগ্ন; দরিদ্র সুরেশ তাহার মলিন শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট। দৃশ্য উঠিবার সঙ্গে-সঙ্গেই শয্যায় শায়িতা তপতীর সম্মুখে চামেলী ও নন্দলালকে নৃত্য ও গীত করিতে দেখা যাইবে।]

(চামেলী ও নন্দলালের গান)

মাটির বুকে মানুষ মোরা, আকাশতলে মোদের ঠাঁই।
আমরা যে হায় এই দুনিয়ায় বাঁধন ছেঁড়া ওরে ভাই॥

পথিক মোরা দেশ-বিদেশের,
নাই কিছু ঠিক এই জীবনের—
আজকে যেথায় বাঁধি বাসা, কাল যে সেথায় ওরে নাই ॥

পথের ধূলায় জন্ম মোদের
ধূলার বুকেই মরণ—
দিন কাটাতে ধূলার বুকে
তাই নিয়েছি শরণ।
চাঁদ সূরুযের আলোর হাসি,
খুসীর নেশায় আমরা ভাসি ;
এই দুনিয়ার ধন-দৌলত আমরা কভু নাহি চাই ॥

চামেলী। (নৃত্য-গীতান্তে) পয়সা দে বাবু !

সুরেশ। (শুষ্ক হাসিয়া) পয়সা ! হুঁ !

চামেলী। গান শুনবার বেলায় তো কথা কস্‌নি বাবু? তখন তো বেশ শুনে যাস্‌ !

নন্দলাল। বাংগালী বাবুরা ফতু বাবুরে চামলী ! কাপড় জামার বাহার কোরেই এরা গেল !

চামেলী। দে, দে বাবু পয়সা দে ! আমাদের আবার অন্য দিকে যেতে হোবে।

সুরেশ। রোজ-রোজ এমন কথা বলে আমাকে কেন কষ্ট দাও চামেলী ?

নন্দলাল। রোজ-রোজ গান শুনো কেন সুরিশবাবু? তোমাদের বাংগালীবাবুদের সম্‌ঝাতে আমাদের বাকী নেই ! রাস্তায় চাম্‌লী আর আমি যখন গান ধরি, তখন সব ভেড়ার

পালের মত ছুটে আসে। আর যেই পয়সার জন্যে হাত পাতি, তখনই ব্যস! কেউ কোথাও নেই!

তপতী। (বহু কষ্টে) ওগো শুন্‌ছো?

সুরেশ। (নিকটে আসিয়া) কী?

তপতী। একটু…একটু জল!

(গেলাস হইতে জল তপতীর গালে দিয়া পুনরায় পূর্বের স্থানে বসিল।)

চামেলী। (একটা সিকি ছুড়িয়া দিয়া) নে বাবু, নে! কারুর দিয়ে দু'টো কোমলা লেবু আনিয়ে বউকে খাওয়াস্‌!

নন্দলাল। ধন্যি বাবু! বউটাকে শুকিয়ে-শুকিয়ে মারলি! তোর বাহাদুরী আছে!

সুরেশ। শুকিয়ে নয় নন্দলাল, আমা'র বউয়ের জ্বর!

নন্দলাল। জ্বর তো ডাগ্‌দার দেখাওনা! হাঁ করে বসে আছো কেনো?

সুরেশ। ডাক্তারদের যে তোমাদের মত প্রাণ নেই নন্দলাল!

নন্দলাল। চল্‌, চল্‌ চামলী! সুরিশবাবুটা একটা মনিষ্যিই নয়!

(গান গাহিতে-গাহিতে প্রস্থান)

সুরেশ! ঠিক কথা বলেছো নন্দলাল, আমি মানুষ নই।

তপতী। ওগো! আমি বোধহয় আর বাঁচবোনা। আমার মাথার কাছটায় একটু ব'সনা!

সুরেশ। (নিকটে আসিয়া) বাঁচবেনা? তাহলে তো ছুটি পেলে! কী পরিবর্তন! কোথায় সেই সুরেশ চৌধুরী আর কোথায় সেই তপতী! চমৎকার!

তপতী। হ্যাঁগা, যদি মরে যাই, তোমার খুব কষ্ট হবে?

সুরেশ। কষ্ট! তা একটু হবে বৈকি! কিন্তু তা বেশীদিনের জন্যে নয়।

তপতী। কেন ?

সুরেশ। কারণ সুরেশ চৌধুরীও মৃত্যুর হাতছানি দেখতে পাচ্ছে তপতী!

তপতী। অমন কথা বোলোনাগো! তাহ'লে আমি যে মরেও শান্তি পাবোনা!

সুরেশ। তোমার বাবার কাছে যাবে তপতী ?

তপতী না।

সুরেশ। এমনি অসহায়ভাবে মৃত্যুকে বরণ করে' নেবে? তার সঙ্গে যুদ্ধ করবেনা ?

তপতী। না।

সুরেশ। কিন্তু আমি তা পারবোনা। আমি উঠলুম। (উঠিল)

তপতী। কোথায় যাবে ?

সুরেশ। যে কোন উপায়ে শেষবারের মত একটা ডাক্তার আমি নিয়ে আসি—

তপতী। কিন্তু তার প্রয়োজন কিসের? বড় জোর দু'টো কী তিনটে দিন—

সুরেশ। তাহলেও আমি যাই তপতী। মৃত্যুটাকে আমি এমনি-এমনি ছাড়বোনা।

তপতী। কিন্তু তিনদিন যে তুমি কিছু খাওনি!—

সুরেশ। তাহোক, আমি আসি এই! কিন্তু তোমার কাছে কাকে রেখে যাই? (বাহিরের দিকে চাইয়া) ওই যে···কমিরুদ্দি

যেন এদিকে আসছে। ওকেই বসিয়ে রেখে যাই।......
কমিরুদ্দি! কমিরুদ্দি!

(একটা বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে কমিরুদ্দির প্রবেশ)

কমিরুদ্দি। কী সুরিশবাবু, মত ঠিক হলো?

সুরেশ। সেজন্যে তোমাকে ডাকিনি কমিরুদ্দি, আজ আমার একটু উপকার করো।

কমিরুদ্দি। উব্‌গার? পাকিটমারের কাছে উব্‌গার চাইছো সুরিশবাবু? বলো, কী বলবে।

সুরেশ। আমার স্ত্রী মরণাপন্ন, একটু এখানে বসো। আমি চট করে একটা ডাক্তার ডেকে আনি।

কমিরুদ্দি। মার জন্যে ডাগদার আনবে? আচ্ছা তা যাও। তবে হাঁ, ভড়িঘড়ি চলে আসবে। সবে এক বেটার পেছু লিয়েছিলুম, শালা না কেটে পড়ে। যাও, আমি বসছি। (দাওয়ার এক কোনে বসিয়া বাহিরের দিকে অবিরত তাকাইতে থাকিল)

সুরেশ। আচ্ছা। [প্রস্থান]

কমিরুদ্দি। মা!

তপতী। কী বাবা?

কমিরুদ্দি। শরীলটা কী তোমার খুবই খারাপ?

তপতী। হ্যাঁ বাবা, বোধহয় বাঁচবোনা।

কমিরুদ্দি। কী বললে? বাঁচবেনা? মরতে তোমায় দিবে কে? শালা সুরিশবাবুটা যে একটা মনিষ্যি নয়, নইলে কী তোমাদের গায়ে এতটুকু আঁচ লাগতে দিতুম?

তপতী। সবই আমাদের কপাল বাবা! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল)

কমিরুদ্দি। ওসব কোপাল-টোপালের কোথা আমাকে শুনিওনা।

শুরিশবাবুকে এতো করে বললুম, আমাদের কারবারে লেবে পড়ো—দশ আনা ছ' আনা সেয়ার থাকবে! বসে-বসে আয় মা, বসে-বসে আয়! তা শালা সুরিশবাবু কথাটা কানেই লেয়না।

তপতী। আমাদের পক্ষে কাজটা যে খুব খারাপ বাবা। পকেটমারা কাজ কী ভালো?

কমিরুদ্দি ওসব ভালো-মোন্দোর কোথা বাদ দাও মা! এবাজারে কোন্ শালা না পাকিট মারে, বলতো? বেবসাদার থেকে সুরু করে' সব শালাই আমাদের দলে। আমরা কেঁচি দিয়ে মারি, তারা মুখু দিয়ে আর কলম দিয়ে। মরে যদি আমরা নরকে যাই, সে শালারাও আমাদের পেছু লেবে!

তপতী। তাহলেও ও কাজ আমাদের নয়, বাবা।

কমিরুদ্দি। (বাহিরের দিকে চাহিয়া) মা! মা!

তপতী। কীরে?

কমিরুদ্দি। সেই শীকারটা এদিকে আসছে। শালার বুক পাকিটটা নোটের চোটে ফুলে রয়েছে! একবার টেরাই লিই! তুমি একলা থাকতে পারবে তো?

তপতী। পারবো! কিন্তু একাজ ছেড়ে দেনা, বাবা।

কমিরুদ্দি। বাজে বোকোনা! (উঠিয়া) আল্লা বলে দেখি! শা-লা! পস্ কোয়াটার থেকে বেরুলো! মালদার বোধহয়!

[প্রস্থান]

তপতী। ঈশ্বর! আর কতো,—কতোদিন এভাবে শাস্তি দেবে ভগবান?

(ডাঃ পুলক সেনকে লইয়া সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। তপতী! তপতী! ভগবান বোধহয় তোমাকে এযাত্রায় রক্ষা করলেন! কাকে এনেছি, দেখ।

তপতী। কে? কে এসেছে গো?

পুলক। আমি, তপতী দেবী।

তপতী। ও! ডাক্তারবাবু! বাঁচান ডাক্তারবাবু, বাঁচান! আমি বাঁচতে চাই!

সুরেশ। পুলকবাবু আজকাল খুব বড় ডাক্তার হয়েছেন, তপতী! তোমার খুব ভাগ্য যে ওঁকে সামনে পেয়ে গেছি! (ইতিমধ্যে ডাক্তার তপতীকে পরীক্ষা করিতে থাকিল)

পুলক। (পরীক্ষা করিয়া একান্তে) হ্যাঁ, এদিকে একবার শুনুন সুরেশবাবু!

সুরেশ। কী ডাক্তারবাবু?

পুলক। খুব ভালো তো বুঝছিনা। এতো উইক্ পেসেণ্ট যে এখনো বেঁচে কথা কইছে—এতেই আমি যথেষ্ট আশ্চর্য হচ্ছি—

সুরেশ। দুর্বলতার যথেষ্ট কারণ আছে ডাক্তারবাবু, কিন্তু বলুন, বাঁচবার কী ওর কোন উপায় আছে?

পুলক। উপায়? তা আছে বৈকি! কিন্তু (সুরেশের মলিন বেশ ও অবস্থা দেখিয়া লইয়া) আপনার কাছে সে আকাশকুসুম!

সুরেশ। কী বলুন? সম্ভব হ'লে আমি প্রাণ দিয়েও—

পুলক। প্রাণ দিয়ে প্রাণ দান সে সে-যুগে হ'তো সুরেশবাবু!

সুরেশ। দেরী করবেননা ডাক্তারবাবু, বলে ফেলুন!

পুলক। তপতী দেবীকে বাঁচাতে হ'লে এখন সর্বপ্রথম চাই সুচিকিৎসা এবং সুপথ্য। পারবেন?

সুরেশ। আপনাকে যখন পেয়েছি, তখন পারবো বৈকি ডাক্তারবাবু! আপনি চেষ্টা করুন!

পুলক। চেষ্টা! কত টাকা আপনার আছে সুরেশবাবু?

সুরেশ। টাকা! এক কপর্দকও নেই। অথচ—

পুলক। অথচ তপতী দেবীকে বাঁচাতে হবে! হুঁঃ! আমার কত ফি জানেন সুরেশবাবু?

সুরেশ। ফি! আপনার ফি পুলকবাবু?

পুলক। হ্যাঁ সুরেশবাবু! ডাক্তারী শিখেছি আমরা পয়সা খরচ করে'—! তবে ইওরোপীয়ান পেসেণ্টদের কাছে আমি সিক্সটি ফোর করে নিয়ে থাকি—

সুরেশ। ও!

পুলক। আর ইণ্ডিয়ানদের কাছে থারটি টু—

সুরেশ। ও!

পুলক। আর আপনার সঙ্গে এককালে পরিচয় ছিল—এই সূত্রে আপনি টয়েণ্টিতে কনশেশান এক্সপেক্ট করতে পারেন।

সুরেশ। অশেষ ধন্যবাদ! কিন্তু আপনার এই অতুলনীয় দয়াকে গ্রহণ করতে পারলুমনা বলে আমাকে ক্ষমা করবেন।

পুলক। কেন, আপনার ধনী ভাই ধীরেশ চৌধুরী রয়েছেন, ধনী শ্বশুর গননাথ রায় রয়েছেন—

সুরেশ। আমার কে আছে না আছে সে আমি বুঝবো 'খন! আপনার ভিজিট দেবার মত ক্ষমতা আমার নেই—নমস্কার!

পুলক। ও! আচ্ছা! বাই-বাই! (প্রস্থানোদ্যত)

সুরেশ। পুলকবাবু!

পুলক। বলুন।

সুরেশ। আজ আমার স্ত্রী রুগ্না, আজ আমার স্ত্রীর দেহে যৌবন নেই —না?

পুলক। হোয়াট্ ডু ইউ মিন?

সুরেশ। যেদিন আমার স্ত্রীর মাথা ধরার চিকিৎসা করতে এসেছিলেন, সেদিন তো কই একদিনের জন্যেও ফি'র টাকা চাইতে দেখিনি পুলকবাবু? সেদিন তো না ডাকতে অনেকবারই এসে নিভৃতে আমার স্ত্রীর চিকিৎসা করবার চেষ্টা করেছিলেন পুলকবাবু? ফি'র টাকা জোর করে দিতে যাওয়া সত্ত্বেও নানা ভড়ং মারফৎ তা গ্রহণ করেননি পুলকবাবু?

পুলক। বাজে কথা শোনবার মত অবসর আমার নেই, আমি যাচ্ছি!

সুরেশ। যাবেন নিশ্চয়ই! কিন্তু এই পৈশাচিকতার শাস্তি একদিন আপনাকে পেতে হবে, তা জানেন? বাংলাদেশের কুলাঙ্গার কোথাকার! নারীমাংস লোলুপ শয়তান কোথাকার! গেট-আউট! নিকালো হিঁয়াসে!

পুলক। বিগার এসেছে! সহমরণে যাবার জন্যে বোধহয় রিহার্সাল দিচ্ছে!

(পাইপে আগুন ধরাইয়া এক গাল ধোঁয়া ছাড়িয়া প্রস্থান)

তপতী। তুমি অতো চেঁচামেচি করতে গেলে কেন?

সুরেশ। দুনিয়ায় কেউ কারোর না! এভরি ওয়ান্ ইজ এ্যালোন্ ইন্ দিস্ ওয়ার্লড্!

তপতী। তোমার ভাইয়ের কাছে তো যেতে পারো!

সুরেশ। কতবার আমি তোমাকে বলবো তপতী যে আমি তা পারবোনা!

তপতী। তবে আমার মাথার কাছটায় বসে আমার মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করো!

সুরেশ। (উঠিয়া মাথার নিকট বসিয়া) বেশ, তাই হোক।...... শোন বাংলাদেশ, শোন বাংলাদেশের নিষ্ঠুর বিধাতা! আজ তোমাদেরই আন্তরিক অভিশাপে মৃত্যুর তপস্যায় বসলো এক হতভাগ্য দম্পতি।

(কতকগুলি কাগজ ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে কমিরুদ্দির প্রবেশ)

কমিরুদ্দি। সব শালা কাগজ—সব শালা কাগজ! শালা এতক্ষণ ধরিয়ে ফলো করিয়ে. শেষকালে ফালতু কাগজ? দেখেন তো সুরিশবাবু, কাগজগুলো কী!

সুরেশ। এখন যাও কমিরুদ্দি, মনটা আমার ভালো নেই!

কমিরুদ্দি। মন শালা তোমার মরবার আগে পর্যন্ত ভালো থাকবেনা! লাও, ঝাঁ করে' একবার চোখটা বুলোও দিকি!

সুরেশ। (দেখিয়া) সবই তো দেখছি প্রায় প্রেমপত্র!

কমিরুদ্দি। পেরেমপত্তর! শালা বুক পাকিট ফুলিয়ে পেরেমপত্তর রেখে-ছেলো? গেছে, বাংলাদেশের ছেলেগুলো সব গেছে সুরিশ-বাবু। আমি ভাবলুম বুঝি নোটের গোছা! (অকস্মাৎ বাহিরের দিকে তাকাইয়া) ওই যে শালা হন্যের মত খুঁজতে-খুঁজতে এদিকে আসছে। শাল্‌লা! দাঁড়া, শিক্ষে দিয়ে দিই! এই—এই—আবে এই শালা পেরেমপত্তর! এই—এই—

(ছুটিয়া প্রস্থান)

সুরেশ। কিন্তু এমন অসহায়ভাবে মৃত্যুকে বরণ করতেও আমার মন

যে চাইছে না তপতী। আমার চোখের সামনে তোমার প্রাণবায়ু ধীরে-ধীরে বেরিয়ে যাবে—এ দৃশ্য যে আমি কল্পনাও করতে পারছিনা!

তপতা। কী করবে তবে, বলো?

সুরেশ। তোমার কী আর কোন গহনাপত্তর নেই?

তপতী। আর তো কিছু নেই। এই দু'টি বছর আমার গহনা বিক্রী করেই তো খেলে। ক'টা পয়সা আর তুমি রোজকার করেছো? দেখতে-দেখতে দু'টি বছর কেটে গেল। আজ আটাশে বৈশাখ—

সুরেশ। (আঁৎকাইয়া) আটাশে বৈশাখ! তপতী, আজ আটাশে বৈশাখ—?

তপতী। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ওরকম করছো কেন?

সুরেশ। আজ আমার জন্মদিন তপতী! হয়তো আমাদের বাড়ীতে কল্যাণী এতক্ষণ কত কী রেঁধে আমার জন্যে হাউ-হাউ করে কাঁদছে!—অথচ আমি আজ মরছি অনাহারে।

তপতী। তুমি ফিরে যাও! গেলে এখনো একটা উপায় হতে পারে।

সুরেশ। সে সংসারের কাছে আমি ত্যাজ্য—কোন মুখে আমি সেখানে যাবো তপতী?

[বিভাসের জামার কলার ধরিয়া টানিতে-টানিতে কমিরুদ্দির পুনঃপ্রবেশ]

কমিরুদ্দি। শালা টেঁকে একটা পয়সা নেই, রাস্তায় বেরিয়েছো? নোটের বদলে পেরেমপত্তর?

বিভাস। আঃ! ছাড়োনা! আমার লাগছে যে!

কমিরুদ্দি। আরে হাট্! বের কর শালা, কী আছে বের কর! শালা

দেড় ঘণ্টা ধরে ফলো করিয়ে শেষকালে কতকগুলো ফালতু কাগজ ?

বিভাস। বিশ্বাস করো, আমার কাছে কিছু নেই।

কমিরুদ্দি। কিছু নেই ? হাইকোর্ট দেখাচ্ছো ? দেখি কাচা, কোঁচা, টেঁক দেখি। (দেখিতে থাকিল) পস্ কোয়াটার থেকে বেরুলো, টেকা নেই ? দেখি—

সুরেশ। গলাটা বিভাসবাবুর মত লাগছে না ?

বিভাস। কে ? আমাকে বাঁচান ! গুণ্ডায় আমাকে মেরে ফেললে ! আমাকে বাঁচান।

সুরেশ। কমিরুদ্দি, ওকে ছেড়ে দাও ভাই !

কমিরুদ্দি। ছেড়ে দিব ? না, না। শালা জড়-হারামি আছে মাইরি সুরিশবাবু ! পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাপ্তেন সেজেছে আর বলে কিনা টেকা নেই !

সুরেশ। উনি আমার বিশেষ পরিচিত, ছেড়ে দাও ভাই।

কমিরুদ্দি। আঁ ! বিশেষ পরিচিত ? আচ্ছা যা শাল্লা। সুরিশবাবুর কথায় তোকে ছেড়ে দিলুম। নইলে গড়ের মাঁঠ টেকে নিয়ে পস্ কোয়াটার থেকে বেরুনো তোকে দেখিয়ে দিতুম ! শালা আমার বউনিটাই মাটি করে দিলে ! দেখি অন্য চেষ্টা — [প্রস্থান]

সুরেশ। তারপর বিভাসবাবু চিনতে পারছেন ?

বিভাস। ঠিক—ঠিক—

সুরেশ। এদিকে দেখুন দেখি, বোধহয় চিনলেও চিনতে পারবেন !

বিভাস। (তপতীকে দেখিয়া) কে ? উনি কী—উনি কী— ?

সুরেশ। হ্যাঁ সেই তপতী দেবী, যিনি একদা আপনার ক্লাসফ্রেণ্ড

ছিলেন, যাঁর কাছ থেকে বছর দুই আগে একখানা তিনশো টাকার চেক এনেছিলেন! চিন্‌তে পারছেন?

বিভাস। পারছি।

সুরেশ। যাক্! আপনার সে খদ্দর কোথায় বিভাসবাবু?

বিভাস। ছেড়ে দিয়েছি।

সুরেশ। কেন?

বিভাস। এখন একটা ভালো চাকুরি পেয়েছি। যতদিন না চাকরি ছিল, ততদিন ওসব করেছি।

সুরেশ। ও! দেশসেবা তাহ'লে বেকাররাই করে থাকেন? যাক্, তা এখানে কেন বিভাসবাবু?

বিভাস। এখানে—এখানে মানে একটা জরুরীকাজ ছিল—

সুরেশ। প্রেস কোয়ার্টারে বুঝি?

তপতী। ও বাজে কথা থাক! বিভাসবাবু!

বিভাস। বলুন!

তপতী। উপস্থিত আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারেন? দিলে এ-যাত্রায় আমার একটা বাঁচবার চেষ্টা হতে পারতো!

বিভাস। টাকা! টাকা তো নেই তপতী দেবী!

তপতী। আছে বৈকি বিভাসবাবু! আপনাদের এককালে অনেক টাকা আমি সাহায্য করেছি, আমার দুঃসময়ে আপনারা আমাকে সাহায্য না-হলেও কিছু ধার দিন বিভাসবাবু।

বিভাস। ধার! আপনাদের কী দেখে ধার দেবো তপতী দেবী? আর যে সাহায্য আপনি করেছিলেন, সে তো আর আমাকে করেননি, করেছিলেন 'নিখিল বঙ্গ শ্রমিক সঙ্ঘ'কে! ধার বা সাহায্য দরকার হ'লে তাদের কাছে গিয়ে চাইতে পারেন।

সুরেশ। দুনিয়াটাই শয়তানরে! নিমকহারাম, বেইমান কোথাকার! বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে! যাও! আর কোন আকর্ষণই নেই তপতী দেবীর—না? না টাকা, না রূপ! গেট্ আউট্—গেট্ আউট্!

(গলা ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে গিয়া পড়িয়া গেল এবং অজ্ঞান হইয়া গেল।)

তপতী। (বিহ্বলভাবে উঠিবার চেষ্টা করিয়া) ওগো! কী হ'লো? তুমি যে পড়ে গেলে! ওগো!

(বুকে হাঁটিয়া আগাইয়া আসিতে গিয়া রোয়াক হইতে পতন ও অজ্ঞান।)

বিভাস। তাইতো!……একী হলো? দু'জনেই যে গেল! সর্বনাশ! পুলিশ যে আমাকেই ধরবে! কী করি, পালাবো?…… হ্যাঁ পালাই!

[পালাইতে উদ্যত এমন সময় কমিরুদ্দির প্রবেশ]

কমিরুদ্দি। কোথায় যাচ্ছিস বে? এরকম চোরের মত কোথায় যাচ্ছিস শালা? (ধরিল)

বিভাস। আমি মারিনি! বিশ্বাস করো, আমি মারিনি! ওরা নিজেরা মরেছে!

কমিরুদ্দি। কারা বে শালা? (দেখিয়া) এঁ্যা! সুরিশবাবু আর মা? কী করলি বে?

বিভাস। আমি কিছু করিনি! তোমার মাথা ছুঁয়ে বলছি পকেটমার-বাবা, আমি কিছু করিনি!

কমিরুদ্দি। কিছু করিসনি? দু' দু'টো মনিষ্যি হাওয়ায় মরলো? এই

তুই সুরিশবাবুর চিনা লোক? হ্যাঁ, চিনালোকের কাজ করিছিস বটে!

বিভাস। মাইরি বলছি—

কমিরুদ্দি। ওসব মাইরি-কালিদিব্বি রেখে দে! দাঁড়া তোকে পুলিশে দিচ্ছি!

বিভাস। পুলিশ! পুলিশ কীরে বাবা? এঁ্যা পুলিশ কীরে? ও বাবা, একী হ'লোরে! ওবাবা পকেটমার, বাঁচাও বাবা!…একি সর্বনাশ! ওবাবা, পুলিশ কীরে! (ক্রন্দন)

কমিরুদ্দি। আরে চুপ মার! শালা নেকা! পুলিশ কাকে বলে চেনেনা! দাঁড়া! (চীৎকার করিয়া) পুলিশ! পুলিশ! ও মোশায়! ও বাংগালী বাবু! আরে এই মোশায়, শুলেন তো ইদিকে—

(অর্ধোন্মাদের ন্যায় ধীরেশের প্রবেশ)

ধীরেশ। কী হয়েছে?

কমিরুদ্দি। চট করে মোড় থেকে একটা পুলিশ ডেকে আনুনতো!

ধীরেশ। কেন?

কামরুদ্দি। পরে শুনবেন মোশায়, এখন যা বলি তড়িঘড়ি করুন, যান—

বিভাস। ও মশায়! বাঁচান মশায়!

কমিরুদ্দি। আরে, ফের চেল্লাচ্ছিস? দিবো গলাটা টিপে! এই মশায়, যাননা!

বিভাস। বাঁচান মশায়! আমি মারিনি, ওরা আপনি মরেছে!

ধীরেশ। কারা?

কমিরুদ্দি। (বিভাসকে) আবে—

বিভাস। ওইযে, দেখুন না।

ধীরেশ। (দেখিয়া) এঁ্যা ! কে—কে? এযে— (সুরেশের নিকট বসিয়া পড়িল)

কমিরুদ্দি। এও দেখছি শালা তেমনি বাবু! আরে যান্ যান্ মোশায়, নিজের কাজে যান্!

ধীরেশ। ভাই! তুমি বিশ্বাস করো, একে আমি চিনি! এঁর নামটি কী বলো?

কমিরুদ্দি। সুরিশবাবু, সুরিশবাবু!

ধীরেশ। আমার দাদা? দাদা! দাদা! একী হ'লো, একী সর্বনাশ হ'লো?

কমিরুদ্দি। মরেছে! শালা ভোদ্দরলোককে ডাকলুম পুলিশ ডাকবার জন্যে তা নয় এসেই কাঁদতে বসলো? আরে এই মোশায়, মেয়েছেলের মত কাঁদছেন কেন? দরদ তো দেখছি একদম ছেপিয়ে যাচ্ছে! বলি, এতদিন ছেলেন কোথায়?

ধীরেশ। সে কথা পরে শুনো ভাই! এখন তুমি একটু চেষ্টা করে আমার দাদাকে বাঁচাও। এখনো নিঃশ্বেস পড়ছে! একটু জল—একটু জল আনো!

কমিরুদ্দি। (বিভাসকে) বোস শালা এখানে! কোথ্ থেকে এই ভোদ্দরলোকটা এসে সব ভেস্তে দিলে! বোস্!

ধীরেশ। যাও ভাই!

কমিরুদ্দি। যাচ্ছি মশায় যাচ্ছি! একেবারে হুকুম চালাচ্ছেন যে! কমিরুদ্দি কারুর হুকুম তামিল করেনা! (প্রস্থান)

ধীরেশ। দাদা, কেন এতো অভিমান? কিসের এতো অভিমান? কার ওপর অভিমান করে তোমার এ-বেশ দাদা?

(কমিরুদ্দির জল লইয়া প্রবেশ)

কমিরুদ্দি। লিন মোশায়, পানি লিন্! আর উদিকে একটা লাশ পড়ে আছে, সেটাও দেখবেন!

ধীরেশ। কে? বৌদি? এঁ্যা! দাদা-বৌদি দুজনেই আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চায়! (সুরেশের চোখে-মুখে জল দিল)

সুরেশ। (চক্ষু মেলিয়া) কে? কে? তুই কে রে?

ধীরেশ। আমি—আমি দাদা, আমি তোমার ধীরেশ!

সুরেশ। ধীরেশ? ধীরেশ! আমার প্রাণের ভাইরে! (ভাইকে জড়াইয়া ধরিল)

কমিরুদ্দি। আরে এই মোশায়! এই সুরিশবাবু! ভাইকে পেয়ে তো খুব ঢোলাঢুলি করছেন! ওদিকে যে একটা পরের মেয়ে পড়ে রয়েছে—সেটা কী আপনাদের কান পাকড়ে বলে দিতে হোবে?

সুরেশ। আমাকে একটু ধর্ ধীরেশ! (ধীরেশ ধরিয়া তপতীর নিকট আনিল) তপতী! তপতী! দ্যাখো—দ্যাখো কে এসেছে! (চোখে-মুখে জল দিল)

তপতী। (চক্ষু মেলিয়া) কে? কে এলো?

ধীরেশ। আমি! আমি বৌদি! ওঠো! আমাকে ক্ষমা করো বৌদি!

কমিরুদ্দি। ক্ষমা করো! এতোদিন ছেলেন কোথায় মোশায়? না খেতে পেয়ে যখন দু'দু'টো মনিষ্যি মরতে বসেছেলো তখন তো একবার খোঁজ পর্যন্ত লেন নি! এখন এসেছেন সোহাগ দেখাতে! হুঁঃ!

সুরেশ। অমন করে' বোলনা কমিরুদ্দি! ও আমার ভাই!

কমিরুদ্দি। আপনার ভাই আছে, আপনার আছে—আমার কী? আমি

কী ওকে ভয় করি নাকি? আমার মোশায় শাপ্-শাপ্ কোথা, তা সে বাবাই হোক আর মেশোই হোক!

ধীরেশ। তোমার কাছে ঋণী ভাই! আর একটু কাজ করো! মোড় থেকে একটা ঘোড়ারগাড়ী যদি ডেকে এনে দাও—

কমিরুদ্দি। যাচ্ছি মোশায়, যাচ্ছি! ওরকম অওডারি সুরে কথা বলবেননা বলে দিচ্ছি! কমিরুদ্দি কারুর হুকুম তামিল করেনা।

(বিভাসকে) আবে তুই শালা মরকোটের মত এখনো এখানে বসে আছিস? যা! ভাগ্-ভাগ্! শাল্লা আমার পেরেম-পত্তর!

বিভাস। সুরেশবাবু, তপতী দেবী, নমস্কার! মশায় আপনাকেও নম—

কমিরুদ্দি। (বিভাসকে ধরিয়া) আবে চল্! তোর নোমোসকারের কেঙাল এরা নয়, চল্—

(বিভাসকে টানিয়া কমিরুদ্দির প্রস্থান)

সুরেশ। গাড়ী কী হবে ধীরেশ?

ধীরেশ। তোমরা বাড়ী যাবে দাদা!

সুরেশ। আবার—?

ধীরেশ। কোন কথা নয়, আর কোন কথা নয়! দু' বছর এ পা দু'খানি দেখিনি! দু' বছর এ মুখখান দেখিনি—আমাকে আর কোন কথা বোলোনা, আমি শুনবোনা!

(কমিরুদ্দির প্রবেশ)

কমিরুদ্দি। লিন্ মোশায়, গাড়ী এসেছে!

ধীরেশ। ওঠো দাদা, বৌদি ওঠো!

(নন্দলাল ও চামেলীর গান গাহিতে-গাহিতে প্রবেশ)

কমিরুদ্দি। আবে গান্ থামা নন্দোয়া! ইদিকে সুরিশবাবু আর মা চলে যাচ্ছে—

নন্দলাল। চলে যাচ্ছে ! কোথায় ?

কমিরুদ্দি। কোথায়! নেচে-নেচে তোর মগজটা একেবারে উল্টে গেছে! বাড়ী যে বাড়ী, নিজেদের বাড়ী!

সুরেশ। হ্যাঁ ভাই, আমার ভাই আমাদের নিতে এসেছে।

তপতী। আমার ঠাকুরপো!

ধীরেশ। আমি বৌদিকে ধরছি! দাদা, তুমি এগোও!

সুরেশ। (উঠিয়া) কমিরুদ্দি, আসি ভাই!

কমিরুদ্দি। (চোখের জল সামলাইয়া) আসবেন তো আসবেন, তা শোনাচ্ছেন কাকে? দু' বচ্ছর আমাদের কাছে ছেলেন বলে ভাবছেন কমিরুদ্দি কাঁদবে? সেটি ভাববেননা! আমরা পকেটমারের ছেলে—তিন পুরুষ ধরে এই কাজ করে আসছি—আঁখের পানি কাকে বলে জানিনা!

তপতী। আসি বাবা।

কমিরুদ্দি। এসোনা মা, এসোনা! হাজারবার এসোনা! আমাকে কী ভয় দেখাচ্ছো? মা বলেছি বলে'—? ওরকম মা আমরা হাজার লোককে বলে থাকি। (আড়ালে চোখ মুছিতে লাগিল)

ধীরেশ। ঘরের ভেতর এদের যদি কোন জিনিষ থাকে নিয়ে এসো না ভাই!

কমিরুদ্দি। আবার হুকুম চালাচ্ছেন মোশায়? কমিরুদ্দি কারুর হুকুম তামিল করে না—হাঁ।

(ঘরের ভিতর প্রস্থান)

ধীরেশ। চলো দাদা, আমরা ততক্ষণ এগোই—

সুরেশ। চল্!

[নন্দলাল ও চামেলীকে বিদায় জানাইয়া ধীরেশ, সুরেশ ও তপতী বাহিরের দিকে প্রস্থান করিল। নন্দলাল ও চামেলী চোখ মুছিতে-মুছিতে অপরদিকে প্রস্থান করিল। ঘরের ভিতর হইতে একটি বিছানার বাণ্ডিল ও একটি মাদুর লইয়া প্রবেশ করিল কমিরুদ্দি। মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইল, তারপর বাইরের দিকেই চলিয়া গেল। শূন্য হাতে আবার ফিরিয়া আসিল। সুরেশ ও তপতীর পরিত্যক্ত স্থানে অবসন্নভাবে বসিল খুঁটিটি জড়াইয়া। মুখে ভাষা নাই, দুই চোখ দিয়া নামিতেছে কেবল অশ্রুর বন্যা। যবনিকা নামিয়া আসিল ধীরে-ধীরে।]

পঞ্চম অঙ্ক

[মহিমবাবুর বাড়ী। মহিমবাবু কঠিন রোগশয্যায়। পাশে ডাক্তার। পায়ের কাছে অনাথ এবং তাহার অদূরে নরেন বরফ ভাঙ্গিতেছে, বীরেশ মাথায় আইস্‌ব্যাগ ধরিয়া। কল্যাণী নিকটে বসিয়া একটি কমলা লেবুর রস নিঙড়াইতেছে এবং অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে।]

কল্যাণী। একটু এগিয়ে গিয়ে ছাখ্‌নারে অনাথ, ধীরেশ এলো কীনা! ওরে, বাবাকে যে তার দেখা হলোনারে!

ডাক্তার। আপনি অমন করে কাঁদবেন না কল্যাণী দেবী, তাতে মহিমবাবুর নার্ভাসনেস্ আসবে, সেরে উঠতে কষ্ট হবে।

কল্যাণী। সেরে আর বাবা উঠেছেন, কথা বন্ধ হয়ে গেছে, বাবা খাচ্ছেননা—ওরে অনাথ, যা-নারে! শেষবারের মত একবারটি—

ডাক্তার। সেরে উঠবেন বৈকি।

(মহিমবাবু ঈসারায় কল্যাণীকে কাছে ডাকিলেন।)

বীরেশ। দিদি! দিদি! বাবা তোমাকে ডাকছেন।

কল্যাণী। (নিকটে আসিয়া) কী বাবা? আমাদের ফেলে তুমি কোথায় চল্‌লে বাবা? এ হাত, এ স্নেহ আর যে পাবোনা! আজ কোথায় রইলো বড়দা, কোথায় বৌদি, কোথায় ধীরেশ—

ডাক্তার। বীরেশবাবু, আপনার সিসটারকে একটু অন্য ঘরে নিয়ে যান, পেসেণ্ট এতে ট্রাবল্ পাচ্ছেন!

বীরেশ। দিদি, তুমি একটু ওঘরে যাও!

কল্যাণী। নারে না, এখান থেকে আমি কোথাও যাবোনা! (সরিয়া আসিল মাত্র)

ডাক্তার। (পরীক্ষা করিয়া) টু উইক্! কিছুই বুঝছিনা বীরেশবাবু! আচ্ছা রোগের কারণটা যা বললেন—কেবল কী ওই?

বীরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশানের সময় একটি ছেলের নাম সুরেশ এই কথা উঠ্তে বাবা একবার 'সুরেশ' বলেই অজ্ঞান হয়ে যান! তারপর কোনরকমে জ্ঞান ফিরিয়ে সকলে মিলে ধরাধরি করে বাড়ীতে নিয়ে আসি। তারপর এই—

ডাক্তার। ও! সিন্সিয়াররলি স্পিকিং বীরেশবাবু, আমরা আটমোষ্ট চেষ্টা করছি—কিন্তু কোনরকমেই কোন উন্নতি দেখতে পাচ্ছিনা। আর একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, আপনার ফাদার কোন কথা বলতে পাচ্ছেননা। মনে হয়—হি ওয়াণ্ট্স সামথিং—

বীরেশ। সত্যি কথা ডাক্তারবাবু! আমার বাবা মেজদাকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হতে পারেন।

কল্যাণী। মা মরে যাবার পর বাবাই আমাদের সব ছিলেন। কত দুষ্টুমি করেছি, কত অপরাধ করেছি কিন্তু একটি দিনের জন্যেও বাবা বিরক্ত হননি।

বীরেশ। অমন করে তুমি কেঁদোনা দিদি।

কল্যাণী। ওরে, আমি যে থাকতে পাচ্ছিনারে! বাবা চলে যাবেন— একথা যে আমি ভাবতেও পাচ্ছিনারে বীরেশ! বাবার কত সাধের সংসার…!

ডাক্তার। আপনি চুপ করুন। আপনার বাবাও কাঁদছেন। শেষে টুক করে না হার্টফেল করেন।

কল্যাণী। কেঁদোনা, কেঁদোনা বাবা! বাবা আমার মেজো ভাইকে দেখতে চান, যতক্ষণ না সে ফেরে ততক্ষণ বাঁচিয়ে রাখুন ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার। বাঁচানো তো আমাদের হাত নয় কল্যাণী দেবী! আপনার মেজো ভাইয়ের ভাগ্যে যদি বাবাকে দেখা থাকে, তিনি নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন। বীরেশবাবু!

বীরেশ। বলুন!

ডাক্তার। খানিকটা ব্লাড বের করে নিলে কেমনটা হতো! কিন্তু আপনার বাবা এতোই উইক্ যে, সে কাজ করতে আমরা ভরসাই পাচ্ছিনা। এইটি ছাড়া আমরা সবই করেছি।

বীরেশ। আরো কোনরকম চেষ্টা করে দেখুন ডাক্তারবাবু! যত টাকা লাগে দেবো!

ডাক্তার। টাকার কথা তো হচ্ছেনা ভাই! যদি না রোগীই বাঁচলো, টাকা আমি নিই কী করে? আমি কোনো টাকাই নেবোনা।

বীরেশ। সে কী করে হয়? না, না!

ডাক্তার। ডোণ্ট মাইণ্ড ব্রাদার! যন্ত্র দিয়ে ডাক্তার মানুষকে কাটে— যন্ত্রণা দেয় সত্য, কিন্তু ডাক্তারও তো মানুষ, ভাই! নার্ভাস

চেষ্টা করুন, আমরাও চেষ্টা করি, তারপর—

[উন্মাদের ন্যায় ধীরেশের প্রবেশ]

ধীরেশ। দিদি! দিদি! কাকে এনেছি···একী? বাড়ীতে ডাক্তার কেন? বাবা কেমন আছেন দিদি?

কল্যাণী। বাবা আর নেইরে ধীরেশ!

ধীরেশ। নেই? বাবা! বাবা! (ঝাঁপাইয়া পড়িল)

কল্যাণী। ওই গ্যাখ্! সোনার দেহ পড়ে আছে। কথা নেই, খাওয়া নেই, ডাক্তার 'এলে' দিয়ে বলছে—বাঁচবেনা। ওরে ধীরেশ, আমাদের কী হলোরে······

ধীরেশ। বাবা! বাবা! এ কী হলো বাবা? ডাক্তারবাবু, বাবাকে বাঁচান! আমার যে বাবার সেবার এখনো কিছুই হয়নি!

[মহিমবাবু অবিরত বাহিরের দিকে তাকাইতে থাকিলেন।]

ডাক্তার। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি ধীরেশবাবু।

ধীরেশ। কেন, কী অপরাধে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছো বাবা? (পা জড়াইয়া) বাবা!

কল্যাণী। অত ভেঙে পড়িসনি ধীরেশ! হ্যাঁরে, বড়দার কোন খবর পেলি?

ধীরেশ। বড়দা, বৌদি বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বলেন, বাবা এসে হাত ধরে না নিয়ে গেলে আমরা যাবোনা। ওরে বীরেশ, যা দাদাকে গিয়ে বল যে, বাবা আর·· বাবাগো!

[বীরেশের প্রস্থান; মহিমবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।]

কল্যাণী। ওগো বড়দাগো, একটু আগে কেন এলেনাগো?

ধীরেশ। একবার—একবারটি কথা কও বাবা! একবারটি আমাকে ডাকো। কত আশা করে বড়দাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম… তুমি যে চলে যাচ্ছো বাবা!

(সুরেশ, তপতী ও বীরেশের প্রবেশ)

ধীরেশ। বড়দা, বড়দা গো! এই ত্থাখো, আজ বাবার কী হাল হয়েছে! বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চান বড়দা!

সুরেশ। (বাবার পায়ের উপর পড়িয়া) বাবা! আমি ফিরে এসেছি—ফিরে এসেছি বাবা! তুমি যেওনা। আর আমি তোমার অবাধ্য হবোনা! আর আমি তোমার মনে ব্যথা দেবোনা বাবা!

কল্যাণী। বৌদিও এসেছে বাবা। তোমার বড় সাধের বৌমাও এসেছে।

(অকস্মাৎ মহিমবাবুর চোখ দু'টি আনন্দে জ্বলিয়া উঠিল, তিনি যেন মুহূর্তে নবজীবন লাভ করিলেন: সকলের হাত ছাড়াইয়া শয্যাশায়ী রোগী উঠিবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন।)

ধীরেশ। ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!! বাবা উঠছেন!

ডাক্তার। মহিমবাবু উঠবেননা। সর্বনাশ……হার্টফেল করবেন!

(মহিমবাবু ততক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছেন,……সর্বাঙ্গ তাঁহার কাঁপিতেছে, কী যেন বলিবার জন্য তাঁহার ঠোঁট দুইটিও অস্বাভাবিকভাবে নড়িতেছে, গলার মধ্যে একটা চাপা আওয়াজও শোনা যাইতেছে,… দুই চোখে নামিয়াছে আনন্দাশ্রুর ধারা। কম্পমান হাত দুইটি বাড়াইয়া কাহাকে জড়াইবেন, কাহাকে

ধরিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। প্রমাদ বুঝিয়া ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে শোয়াইবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন এবং নরেনকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন :—)

ডাক্তার। তুমি শীগ্‌গির ডক্টর সান্যালকে ফোন করে দাও! হারি আফ! (নরেন এই আনন্দের দৃশ্য ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল।) যাও, দেরী করলে একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। [নরেনের প্রস্থান] মহিমবাবু, শান্ত হোন, শুয়ে পড়ুন! কোনরকম উত্তেজনা এখন আপনার পক্ষে সুখকর নয়। প্লিজ্—

মহিম। (দুই হাত বাড়াইয়া সুরেশকে উন্মাদের ন্যায় বুকে জড়াইয়া) আ—মা—র রতন! আমার বুক জুড়োনো ধন!! আমার সু-রে-শ···

(মহিমবাবুকে অকস্মাৎ কথা বলিতে দেখিয়া একমাত্র ডাক্তার ছাড়া সবাই আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল।)

কল্যাণী। বাবা কথা কয়েছেন!

ধীরেশ। বাবা, আমাকে ডাকো!

বীরেশ। বাবা···

সুরেশ। বাবা···

(মহিমবাবু তখন বিহ্বলভাবে সুরেশের দুই গাল ধরিয়া একটি স্নেহচুম্বন দিবার পরম আগ্রহে মুখটি তাহার কপালের দিকে আনিতে গেলেন এমন

সময় টেবিলের উপর হইতে লণ্ঠনটি হঠাৎ সশব্দে পড়িয়া নিভিয়া গেল। মহিমবাবু তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেলেন।)

কল্যাণী। (সভয়ে) বাবা!

সুরেশ। বাবা!

ধীরেশ। বাবার কী হলো ডাক্তারবাবু?

(বীরেশ লণ্ঠনটি তুলিয়া আবার জ্বালিতে চেষ্টা করিতে থাকিল কিন্তু যতবারই জ্বালিতে যায়, ততবারই নিভিয়া যায়। ডাক্তার ওদিকে মহিমবাবুকে দেখিয়া সম্মুখে আসিলেন। সকলে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে।)

ডাক্তার। বৃথা চেষ্টা করবেননা বীরেশবাবু, ও আলো আর জ্বলবেনা।

সুরেশ। (আঁৎকাইয়া) এ্যাঁ—!

ধীরেশ। বাবাকে কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। দেখলাম ভালোই! দেখলাম স্নেহ, মমতা, প্রীতি আর শ্রদ্ধার জন্য আমাদের দেশেরই মানুষ পাথর হয়, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে, পৃথিবীকে দূরে ঠেলে দেয়···

ধীরেশ। খুলে বলুন ডাক্তারবাবু—

ডাক্তার। (ব্যাগ হাতে লইয়া) মহিমবাবু আর নেই! নমস্কার!

[প্রস্থান]

[মুহূর্তে ধীরেশ 'দাদা' বলিয়া সুরেশের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল, সঙ্গে-সঙ্গে আসিল ক্রন্দনরত বীরেশ ও অনাথ। সুরেশ দুই হাতে তিনটি ভাইকে

বজ্রের মত চাপিয়া ধরিল। অদূরে শবদেহের পদপ্রান্তে কাঁদিয়া উঠিল কল্যাণী ও তপতী। দুই হাতে তিনটি ভাইকে আগলাইয়া নীরবে অশ্রুবিহীন চোখে সুরেশ তাকাইল একবার উপরের দিকে। যবনিকা নামিয়া আসিল।]

— শেষ —